আবার আমি

তারানাথ ব্রহ্মচারী

প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ (প্রকাশ ভবন)

মাঘ, ১৩৫৭

প্রকাশক ঃ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ

শ্রীমনোজ বিশ্বাস

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীঅশোককুমার পাঁজা
শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
১৫১ রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

সুহৃদবরেষু

এক অজানা রাজ্যের রহস্য সুতং লামার দু'চোখ উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আমি নিথর-পাথরের মতো তিব্বতের এই পাহাড়ের গুহার মুখে গালে হাত দিয়ে বসে। আমার মন আমার প্রাণ আমার দেহ ওই দৃষ্টির বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

আমার কাছ থেকে খুব সামান্য তফাতে উনি বসে। আমি বাইরে উনি ভেতরে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইলেও রেশমীরোদের আলোয় ওঁর মুখখানা অন্য জগতের হয়ে উঠছে। ওঁর চোখ ওঁর মুখ এবার কথা কইতে শুরু করবে—আমার মন বলছে।

গম্ভীর গলা স্পষ্ট বাণী। কাছে হলেও, যেন মহাশূন্য থেকে ভেসে আসছে আমার কানে।

বলছেন সুতং লামা···

এটা রাতের বিভীষিকা, না মনের বিকার, না সত্যিসত্যি দেখছে? সুলভার ভেতরে মিশমিশে কালো আতঙ্কে ভরে উঠছে। টুঁটিটা চেপে ধরেছে সজোরে কে যেন। একটা খুন দেখেছে, এটা দ্বিতীয়। একই তরুণ দুজনের দেহ থেকে ছিনিয়ে নিল ওদের প্রাণ।

একটির প্রাণ নেব বলে নেয় নি, হঠাৎই নিয়ে ফেলেছে উত্তেজনার বশে, নিজের খুনী রাগকে আয়ত্তে আনতে পারে নি।

দ্বিতীয়? জেনেশুনে ঠাণ্ডা মাথায়। একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এ খুন।

প্রথমটা পুরুষ, দ্বিতীয়টা মেয়ে। পুরুষের গায়ে হাত পড়েছিল, কিন্তু মেয়েটির গায়ে হাত পড়ল না একদম। কাছে গেল না পর্যন্ত, স্পর্শ করা তো দূরের কথা। নিজের মুখে মুখোশটা গলিয়ে নিল শুধু। তারপর সিলিণ্ডারের মুখটা সন্তর্পণে খুলে দিল।

ঘরখানা ভরে উঠল বিষাক্ত গ্যাসে। প্রাণঘাতী কার্বন মনোক্সাইডে। ঘরের মেয়েটি রুগ্ন। এমনিতেই ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়ল মেয়েটি। ঘরের অন্য লোকেদেরও মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে।

বসে থাকতে পারল না সুলভা। উঠে পড়ল। কিন্তু গিয়েও তো কাউকে রক্ষে করতে পারবে না সে। মর্মান্তিক ব্যাপার। তবু যেতে যেতে সব শেষ হয়ে যাবে।

বেলেপাথরের তিনতলা বাড়িটা অন্ধকারে ঢেকে গেছে। আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না সুলভা।

আলো-আঁধারিতে ওই জওয়ানকে চিনে নিতে এতটুকু অসুবিধে হয় নি। শীতানু।

এই শীতানুই মনোয়ার।

মনোয়ার খুন করেছিল কুঞ্জরকে! কারণ—কুঞ্জর একটা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলেছিল বলে। তাও মত্ত অবস্থায়। মদের নেশায় টর তখন।

অমৃতার চুলের মুঠি ধরে রোজ রাত্তিরেই মারধোর চলত। এই মারধোর করাটা—এও একটা নেশায় দাঁড়িয়েছিল কুঞ্জরের মদ খাওয়ার মতো। একদিন না মারতে পারলে দিনটা ব্যর্থই যেত বুঝি।

স্বামীর ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে অমৃতা। ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করেছে। খালি ছেলেটার মুখ চেয়ে পড়ে পড়ে মার খেতে হয়েছে। ছেলেটা মানুষ হয়ে উঠুক। এতদিন সয়েছে। আর দু'তিন বছর বই তো নয়। উনিশ চলছে, বাইশ-তেইশে লায়েক হয়ে উঠবে। ছেলের হাত ধরে যেখানে দু'চোখ যায়, চলে যাবে।

তা আর হল না।

ছেলের মনও বিষিয়ে উঠছিল ক্রমশ বাপের ওপর। রাত্তিরে পাশের ঘরে শুলেও, মাঝে মাঝে উঠে এসেছে বারান্দায়। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

সেদিন অমৃতার গলার স্বরে কান্না ঝরছে। বিনয় করে বলেছে, আমায় মেরে ফেল কোন ক্ষতি নেই, মুখটা বন্ধ কর দয়া করে। ছেলেটার ঘুম ভেঙে যাবে যে। এমন বিচ্ছিরি গালাগালি—বাপঠাকুরদা ধরে টানাটানি—ওর কানে গেলে, কি ভাববে তোমায়? শ্রদ্ধাভক্তি কি থাকবে আর? দোহাই তোমার। দু'পা জড়িয়ে ধরেছে অমৃতা।

পা ছাড়িয়ে নিয়ে অমৃতার বুকে লাথি মেরেছে কুঞ্জর সজোরে। ছিটকে পড়েছে অমৃতা দরজার ধারে। চৌকাঠের আঘাতে কপাল কেটে রক্তারক্তি।

মনোয়ার ঘরে ঢুকবে কি ঢুকবে না ইতস্তত করেও ঢুকে পড়েছে। মায়ের আদেশ অমান্য করে ফেলেছে সে।

মা না কিছু ভাঙলেও, মনোয়ারের বোঝার বয়স হয়েছে, কেন বাবা বেশি রাতে বাড়ি ফেরে, কেন মায়ের ওপর অসন্তুষ্ট। অন্য স্ত্রীলোকের রূপের সাগরে বাবা হাবুডুবু খাচ্ছে। মা চোখের বালাই। দুষ্টু মেয়ের মিষ্টি কথা বাবার কানে মধু ঢালে। মায়ের হিতোপদেশ গরম সীসে-গলা।

মাকে গালাগালি দেয়ার সময়—প্রতি রাত দুপুরেই—স্ত্রীলোকটির গুণগানে চতুর্মুখ ব্রহ্মা একেবারে বাবা। বাবা কত বড় অন্যায় করেছে, একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে ভেসে সংসার ভাসিয়ে দিচ্ছে—চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া—ছেলে হয়ে—তারই কর্তব্য। অর্থাৎ বাবাকে ওসব পথে পা মাড়াতে না দেয়া। নিষেধ করা, আটকানো।

এ কথাও বলে দেয়া প্রয়োজন—মায়ের ওপর হাত উঠলে, ফল ভালো হবে

না। মাকে জানিয়েছে মনোয়ার নিজের মনোভাব।

অমৃতার মুখের রক্ত সরে গেছে পলকে। ধবধবে সাদা কাগজের মুখ! হাত দুটো ঠান্ডা বরফ। মনোয়ারের হাত দুটো চেপে ধরেছে অমৃতা। ঠোঁট কাঁপছে, গলা কাঁপছে। টুকরো টুকরো কাঁপা কথা বেরোচ্ছে মুখ দিয়ে। বলল, তোর মধ্যে বনের পশু বাসা বাঁধবে—কল্পনা করিনি যে রে। তুই ছেলে, বাপ-মার ব্যাপারে নাক গলাবি কেন?

অমৃতা হাঁপাচ্ছিল, একটু চুপ করে দম নিল। তারপর বলল, তুইও কি ওর মতো হবি রে? তোর মুখ চেয়েই যে আমার বেঁচে থাকা।

অমৃতা কেঁদে ফেলল।

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মনোয়ার।—কোন ভয় নেই। বাপকে অপমান করবে না কোনদিন।

চোখের নোনতা জল গাল গড়িয়ে ঠোঁট ভিজিয়েছে অমৃতার। ভেজা ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে। বলেছে, কোন কিছু অসহ্য মনে হলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে, বাইরে পায়চারি করা ভালো, তবু বাবুজীর ঘরে ঢোকা উচিত না।

— দেখো, তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো আমি।

ছেলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে অমৃতা আশীর্বাদ করেছে মনে মনে—সৎবুদ্ধি হোক, পরমায়ু বৃদ্ধি হোক।

মনোয়ার নিজের প্রতিশ্রুতি নিজেই ভঙ্গ করল। মা-ই যদি শেষ হয়ে গেল তো প্রতিশ্রুতি কার জন্য? একটা মানুষের জীবনের কাছে—আগে প্রাণ তারপরে মান—সমস্তই তুচ্ছ।

মায়ের রক্ত দেখে, মনোয়ারের রক্তে আগুন জ্বলে উঠেছে। দৌড়ে ঘরে ঢুকে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছে কুঞ্জরের গালে। গালে বসাতে গিয়েও নিজের অজান্তেই মর্মস্থানে—রগে মোক্ষম আঘাত হেনে বসেছে মনোয়ার।

মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখে, টলে পড়ে গেছে কুঞ্জর মেঝের ওপর।

মায়ের গলা দিয়ে আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে—একি করলি রে হতভাগা!

কুঞ্জরের দুচোখ খোলে নি আর। বন্ধ হয়ে গেছল চিরদিনের জন্য।

সেই মনোয়ার এই শীতানু, একি করল?

মায়ের নির্যাতনের জন্য বাপকে যে সইতে পারে নি একদিন—সে আজ নিজেই একটি মেয়েকে—মেয়েটিও তো মায়েরই জাত—দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে একটুও দ্বিধা করল না। আর ওই মেয়ের সঙ্গে আরো অনেককে। কি পরিবর্তন ওর, কি নিষ্ঠুর ও!

সুলভা শীতানুকে অনুসরণ করবে। ছায়ার মতো ওর পেছনে পেছনে ঘুরবে। সুলভার কাছ থেকে শীতানুর মুক্তি নেই।

সুলভা জানে শীতানু তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে তার অপকর্মের

সাক্ষীর হাত থেকে বেঁচে যেতে পারবে ভাববে। কিন্তু তা হওয়ার নয়। সুলভা শীতানুর হাতে মরবে না। শীতানু মারতে পারবে না সুলভাকে কখনো। যতই জোরালো বিষ ছড়াক না সে তার ঘরের বাতাসে।

কম্বলের আসনটা পাট করে পাথরের তাকে সুলভা তুলে রেখে দিল। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বালিতে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলেছে।

মরুভূমির বুকে গভীর রাতের রূপ আলাদা। দিনের দাবদাহ রাতে অদৃশ্য। কনকনে ঠাণ্ডা। মানুষ-প্রমাণ বালি খুঁড়ে, তার ভেতর ঢুকে শুয়ে রয়েছে লোহানারা। সারা দেহে বালি চাপা, ঠাণ্ডা বাঁচানোর জন্য।

লোহানারা উটের পিঠে মালপত্র নিয়ে যেতে যেতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারে নি। এখানেই এই ভাবে আস্তানা গেড়েছে সবাই। এক একজনের উট চার পা মুড়ে বালিতে মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে।

বাবলা শমীগাছ নিথর-পাথর। গাছের গায়ে হাত ঠেকালে সারা শরীরের রক্ত জমে যায়। এমন বরফঠাণ্ডা। বালি ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে সুলভা। আপাদ-মস্তক মুড়ি দেওয়া একটা গেরুয়া রঙের পশমী চাদরে।

বালির ছোট টিলা বড় টিলা—পাশ কাটাচ্ছে এক এক করে। চতুর্দিক থেকে অসংখ্য পায়ের শব্দ ভেসে আসছে কানে। রহস্যময় হয়ে উঠছে মরুভূমির রাত। টুংটাং মিষ্টি আওয়াজ বাতাসে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারা যেন জলভরা কাঁচের পেয়ালায় হালকা কাঠের ছোট্ট হাতুড়ির ঘা মারছে টুকটুক করে।

বাতাসে টিলার বালি ঝরছে, টিলা ভাঙছে। অপর দিকে গড়ে উঠছে আবার আর একটা টিলা। এই ভাঙাগড়ার খেলায়ও কি মোহ মাখানো দুনিয়া ভোলানো মিঠে বাজনা। এ বাজনা এমন পেয়ে বসে মানুষকে—পাগল করে তোলে।

জয়সলমিরের এ জায়গাটা এমন মরুভূমি হয়ে ওঠে নি একদিনে। এমন দশা হতে কত বছরই না কেটেছে! থর মরুভূমি গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। আগের সবুজ পেটে পুরেছে। বালি আর বালি। কাঁটাগাছের ঝোপঝাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এদিক-ওদিক।

আটশো বছর আগের দুর্গটা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে। পাথরের দেওয়াল ঘেরা পাহাড়ের ওপর। রাওল জয়মল তৈরি করেছিলেন ওটা। তাঁর শৌর্যবীর্যের পরিচয়। সে মানুষ আজ নেই, স্মৃতিটুকু রয়েছে স্রেফ।

সুলভা নিশ্বাস ফেলল জোরে।

শতজনের নিশ্বাস ঝরে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। দাঁড়িয়ে পড়ল সুলভা চলতে চলতে। সে জানে এসময় এখানে এমন শোনায়। একজনের পায়ের শব্দ অসংখ্য জনের, একজনের নিশ্বাস শত জনের। তবু বিভ্রান্তি আসছে। মনে হচ্ছে একের নয়, বহুর। সব জেনেশুনেও ভাবতে ভালো লাগছে। সত্যি বলে মনে করতে ভালো লাগছে।

আর ভালো লাগছে, সে যুগে—সেই অতীতে—যখন ফুলে ফলে ভরা ছিল এই জয়সলমির—যখন নহবতখানায় সুরের ঢেউ দুলে উঠত সকাল-সন্ধেয়, তখন সেও ছিল। রঙিন ঘাগরা দুলিয়ে ওড়নায় মুখ ঢেকে, সইদের সঙ্গে ফুল-বাগাসে নাচগানে হাসিমশকরায় একসঙ্গে মেতে উঠত সকলে।

কি আনন্দেরই না ছিল সেদিন।

ক্রমে সব চলে যেতে লাগল। সবুজ মাটির বুক শূন্য করে চলে গেল গাছ-গাছালি পশুপক্ষী। শেষে মানুষও। কেউ মাটি আঁকড়ে শেষ নিশ্বাস ফেলল, কেউ পালিয়ে বাঁচল।

সেও ছিল এই দু দলেরই মধ্যে। মরেছে এখানে, আবার পালিয়ে বেঁচেছেও দূরে গিয়ে।

একের সঙ্গে অনেকের যে নাড়ীর যোগ ছিল এক সময়—প্রাণের হৃদয়ের যোগ। তারই কি প্রতিধ্বনি ওঠে তাই এখনো নিশুতি রাতে কারো পায়ের শব্দে অনেকের পায়ের শব্দ? কারো নিশ্বাসে বহুর নিশ্বাস বয়ে বেড়ায় নির্জন বাতাসে?

চলতে চলতে সুলভা কেমন হয়ে যাচ্ছে। যদিও শীতানু লক্ষ্য তার। খুব আস্তে আস্তে চলছে। নিজের মনের কথা, না কাদের ব্যথার কান্না শুনছে যেন। –এই মরুভূমির দেশে—আশেপাশে এখনো যেটুকু প্রাণ আছে যেটুকু সম্পদ আছে, লুটে নিচ্ছে নিঃসাড়ে শীতানু। তোমার অতি আদরের। ও আর ওর দলবল ওপর ওপর সাধু সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেমন! কেউ জানে না ওদের নৃশংস প্রকৃতি, ওদের নির্মম কুকীর্তি। একমাত্র তুমি জানো। তোমাকেই প্রতিকার করতে হবে এর। তা না হলে খুনের অপরাধে তুমিও খুনী থেকে—শীতানু থেকে একচুল তফাত নও, একচুল নয়।

ধরতে হবে শীতানুকে। সুলভা চলছে দ্রুত পা চালিয়ে। টুংটাং আওয়াজ শুনছে আবার। কারা যেন গানের সুরে কাঁদছে। বলছে, বাজনাটা তোমার কানে মিষ্টি শোনায় খুব—তাই না? সুরেতেই ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠল ওরা। এক সঙ্গে অনেক গলা। ওরা কথা কইল। –বাজনাটা আমাদের টুকরো টুকরো হাড়-পাঁজরার ঠোকাঠুকি। প্রকৃতির রোষের আগুনে আমরা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেছি সত্যি, সেটার সংখ্যা যেমন, তেমনি শীতানুদের মতো জওয়ানদের আমীর বনার খোরাক হিসেবেও নিজেদের খুইয়েছি অনেক—অনেক। দুটো সংখ্যাই দাঁড়িপাল্লার ওজনে প্রায় সমান সমান। তোমাদের মতো স্ত্রীলোকদের প্রশ্রয়ে হতে পেরেছে শীতানুরা দুর্ধর্ষ খুনী। লুটেরা লোভী। অকালে আমাদের হারিয়ে যাওয়ার কারণ তোমরা। তোমরা, তোমরা ···।

চাদরের ভেতর দিয়ে দু'হাতে দু'কান চেপে ধরল সুলভা। শুনতে পারছে না আর। পালালে নাকি যমও সঙ্গ নেয়। এখানে কথাটা খাটছে। কানে হাত চাপা দিলে, তাড়াতাড়ি চললে হবে কি? এরা যে তার বুকের মধ্যে বাসা

বেঁধে রয়েছে। ব্যথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে সমুদ্রের গর্জন তুলছে ভেতর থেকেই।

অট্টহাসি হাসছে ভেতরে। বলছে, শীতানুর মন ঘোরানোর জন্য যাচ্ছো তুমি? তুমি তো সুলভা। পারবে? পেরেছিল কি অমৃতা?

কুঞ্জরের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় কুঞ্জর কি হয়ে ওঠে নি মনোয়ার? মায়ের কপালের রক্তে যার রক্তে আগুন জ্বলে উঠেছে দপ করে, তারই মনে কোন রেখাপাত করে নি তো মা-র ছেলের জন্য মাথা কোটাকুটি করে রক্তের নদী বইয়ে ফেলাতেও!

কত দেবতার মন্দিরে ধন্না দিয়েছে অমৃতা। চোখের জলে ধুইয়ে দিয়েছে সাধুসন্তদের পায়ের ধুলো। বিপথ থেকে সুপথে ঘোরানোর জন্য কত উপোস-তাপস। জীর্ণশীর্ণ দেহে প্রাণটা বেরোনোর অপেক্ষায় ধুকধুক করেছে কেবল। ফল কি ফলেছে? শূন্য।

অমৃতার মুখের দিকে ফিরেও তাকায় নি মনোয়ার কোন সময়ের জন্য। তবু আশা, ফিরবে ও।

শুরু হল তীর্থযাত্রা।

ছেলে ছেলে করে তীর্থের পথেই প্রাণত্যাগ করেছে অমৃতা। মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে রাস্তায়। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা জল পড়ে নি জিভের ডগায়। পুণ্যার্থীরা মুখ ফিরিয়ে তাকায় নি, পুণ্য লাভের সময় বয়ে যাবে বলে। শেষ সময় কোথাও ইষ্ট দেবতার নাম জপ করবে, তা নয়, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে শুধু মনোয়ারের নাম জপ করেছে অমৃতা। তবু কি মনোয়ার শুধরেছে? শীতানুর মধ্যে মনোয়ারকে দেখে, সুলভার কি তাই মনে হয়?

নিজে নিজেই চিৎকার করে বলে উঠল সুলভা, না, না। কিছু না, বরং মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে একদম। বিবেক, বুদ্ধি, মমতা, সংযম, মানবতা—সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়েছে। একটা দানব।

অমৃতা যা পারে নি, সুলভা তাই পারবে। অমৃতার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করবে সুলভাই। অমৃতা সময় পাওয়ার আগেই জীবনযন্ত্রণার টানাপোড়েনে ফুরিয়ে গেছে। সুলভার হাতে সময় আছে যথেষ্ট। সুলভা একটা হেস্তনেস্ত না করে এত সহজে ফুরোবে না।

সুলভার চলার গতি বাড়ল আবার দ্বিগুণ। ঠাণ্ডাতেও। আগুন ছুটছে প্রতি রোমকূপ দিয়ে। নিজের মনকে সবল রাখার জন্য, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত সংকল্প ঠিক রাখার জন্য মনের কানে শোনাচ্ছে কেবল—আমি সুলভা, শীতানুকে আমার কাছে হার মানতেই হবে। আমার কথা শুনবে, শুনবে কেন, শুনতে বাধ্য হবে। ওর অসৎ বুদ্ধির মৃত্যু হবে, মৃত্যু হবে, মৃত্যু হবে।

বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সুলভা। একটু আগে যে বাড়ি থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়ে দিয়ে সর্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে এসেছে শীতানু, এটা সে বাড়ি নয়। এটাও বেলেপাথরের, তবে দোতলা। পাথরের জাফরি ঘেরা

বারান্দা। এ বাড়িতে থাকে শীতানু। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ।

এখানটা আরো নিস্তব্ধ, আরো ফাঁকা। এদিকে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। দিনেও রাতের নির্জনতা। দেখলে মনে হয়, বাড়িতে কেউ নেই। শমীগাছটা ভূতের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে দরজার পাশে।

ভূতের মতো মনে হতেই জিভ কেটে ক্ষমা চাইল সুলভা মনে মনে দেবী ভবানীর কাছে। একটা কোন খারাপ দৃশ্য মনে গেঁথে বসলে, সেই সময়ের জন্য অন্তত না কিছু দেখা যায়—খারাপের প্রভাব সব চাইতে বেশী বলে, তার প্রতি-ফলনটাও চোখের বাইরে দেখা যায় সমস্ত বস্তুর ভেতরে।

এ ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। শীতানুর ভয়ঙ্কর অশুভ ছায়া সর্বত্র দেখছে সুলভা। দেখেছে দেবীর প্রতীক বিশুদ্ধ শমীগাছটারও ভূতের চেহারা। শমী দেবী দুর্গা। বিজয়া-উৎসবে শমীর পাতাই দেবীর চরণে ছুঁইয়ে আশীর্বাদ-পত্র হিসেবে রাজারাজড়াদের মধ্যে বিলি করেন মন্দিরের পুরোহিত। মাথায় ঠেকিয়ে বলেন, সম্বৎসর শুভ হোক। সর্ব-কর্মে জয় হোক, সিদ্ধিলাভ হোক। মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

মাথার পাগড়িতে আশীর্বাদী-পত্র গুঁজে রেখে, মনোবল ফিরে পায় রাজ-পুতরা। ভক্তরা শমীপাতা নিজেদের মধ্যে বিনিময় করে একে অপরের শুভ কামনা করে।

গাছের তলা থেকে ঝরে পড়া তিনটে শুকনো শমীপাতা কুড়িয়ে নিল সুলভা। নিজের কপালে ঠেকাল বুকে ঠেকাল। বুকের কাছে জামার ভেতর পুরে রাখল। তার জয় সুনিশ্চিত!

দরজাটা আলতো আঙুলে ঠেলে পরখ করে দেখল, বন্ধ কিনা। বন্ধ। ভেতর থেকে খিল কুলুপ এঁটে বন্ধ। চিবুকে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। রাত্তিরেই দেখা করবে, না কাল সকালে? না, কাল সকাল নয়। শীতানু যে কীর্তি করে এসেছে, রাতের ব্যাপার সকালে বাসি হয়ে যাবে ওর কাছে। এখুনিই শাসিয়ে দেয়া ভালো। ও যেন মনে রাখে, তার গোপন কাজের হদিশ কাকে-বকে টের না পাক কেউ—একজন জানে। সুলভা। আজকের ঘটনা জানিয়ে দিয়ে, ওকে চিরদিনের মতো এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করে দিতে হবে। নিজের আগমন জানানোর জন্য লোহার পাতের দরজায় জোরে আঘাত করতে গিয়ে থমকালো। হাত সরিয়ে নিল। পাথরের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ওপর থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ কানে এসে বেজে উঠল। একটি নারীকণ্ঠ একটি পুরুষকণ্ঠ। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে দুটি কণ্ঠস্বর।

উৎকর্ণ হয়ে সুলভা শুনছে।

মেয়ের গলা বলছে, কেউ না পারুক, আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব।

—তার আগে তোমাকেই সরতে হবে।

—দেখা যাক, কে কাকে সরায়।

—মিলাপী, অত বাড়াবাড়ি করো না বলছি। আমার যা খুশি করবো আমি। তোমার সে নিয়ে মাথা খামানোর প্রয়োজন নেই কোন। স্ত্রী, স্ত্রীয়ের মতো থাকবে। আমার কার্যকলাপ দেখার কোন এক্তিয়ার কারো নেই। পুলিসের ভয় দেখাচ্ছো কি? লোকের ভয় দেখাচ্ছো কি? কেউ একগাছা চুল ছিঁড়তে পারবে না আমার।

—আচ্ছা দেখা যাবে'খন।

—তর্ক বাড়িয়ো না বলছি। সরে যাও সামনে থেকে, সরে যাও। সরে যাও! ঠাস করে গালে চড় বসানোর শব্দ হল। নিশুতি রাতে মরুর বুক থেকে চাপা কান্না বেরিয়ে এলো মেয়েটির কান্নায়।

মেয়েটি দৌড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পায়ের দুম দুম শব্দে সদর দরজার খিলান অবধি কেঁপে উঠল! দুড়-দুড় করে নামছে সিঁড়ি দিয়ে। পুরনো বাড়ির ভেতর একটা প্রলয় উপস্থিত হয়েছে যেন। পুরুষটিও উন্মত্তের মতো নামছে পেছু পেছু। ভারী পায়ের শব্দ। মুখে বলছে, খবরদার বলছি, আর এক পা এগোলে কিন্তু প্রাণে বাঁচবে না। প্রাণে বাঁচবে না বলে দিচ্ছি। স্বয়ং ভগবান এলেও বাঁচাতে পারবে না।

মিলাপী এসে দরজা খুলল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। ছুটছে। পেছু পেছু ছুটছে পুরুষ। স্পষ্ট দেখছে সুলভা। এই সেই শীতানু। খুন করে করে বুক দশ হাত। মনে দাগ কাটে না। অভ্যস্ত।

মিলাপীকে ধরতে পারলে শেষ করে দেবে মুহূর্তে। যেভাবে দৌড়চ্ছে, নাগাল পেতে আর দেরী নেই বেশি।

খট্ করে দরজা খোলার আওয়াজটা কানে আসা মাত্র শমীগাছের দেহের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সুলভা। দেখছে সমস্ত, কিন্তু একরকম নির্বিকার চিত্তে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার একটি মেয়েকে খুন করতে দেখবে কি সে? হতেই পারে না। সে বাধা দেবে তার শক্তি অনুযায়ী।

আকাশে চাঁদের সরু ফালি। অগুনতি নক্ষত্র মিটমিট করছে। ওরা থেকেও যা, না থেকেও তা। কোন উপকার নেই। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও নীরব সাক্ষী। চোখ খুলে দেখবে, মুখ খুলে বলবে না কাউকে কোন কথা। শূন্যে মর্তে কত তফাত। কারো প্রাণ যাক, আর থাক—ওদের কিছু এসে যায় না। মিছে মানুষের প্রার্থনা ওদের কাছে, মিছে ওদের অবলম্বন ভাবা। মানুষকেই দেখতে হবে মানুষকে।

সুলভা ছুটল পড়িমরি করে।

ঠাণ্ডা বাতাস তোলপাড় করছে পাণ্ডববর্জিত জায়গায়। মহাকালের তাণ্ডব চলছে যেন মরুর বুকে। একটি মৃত্যুর সঙ্গে একটি জীবনের চরম লড়াই।

নিদারুণ পাঞ্জা কষাকষি।

মিলাপীকে ধরে ফেলে ফেলে অবস্থা। মিলাপী আর ছুটতে পারছে না। টলে পড়ছে। এত দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

চিৎকার করে উঠল সুলভা, আর এক পা-ও এগিয়ো না শীতানু, আর এক পা-ও এগিয়ো না।

আচমকা তার নাম ধরে এমন সময় কে ডাকল, কে বারণ করল এগোতে? দাঁড়িয়ে পড়ল শীতানু। বালির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেছে মিলাপী।

শীতানুর দু'হাত নিশপিশ করছে। এই সুযোগ। মিলাপী তার স্ত্রী নয়, তার শত্রু। শত্রুকে শেষ করে না ফেললে স্বস্তি নেই, শান্তি নেই। তার আদ্যপ্রান্ত সব জানে ও। মিলাপীকে দুধ-কলা দিয়ে এতদিন কালনাগিনী পুষে রেখেছিল শীতানু তার ঘরে। কালনাগিনী চাইছে তার মৃত্যু। ছোবল মারার জন্য ফণা বিস্তার করছে।

শীতানুর মনে হল, এ ডাক এ গলার স্বর তার অপরিচিত নয়। খুব জানা খুব শোনা। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না কে ও।

মেয়েছেলের দুঃসাহস বটে। মাঝরাতে এভাবে এখানে একা ঘুরতে পুরুষমানুষেরও ভয়ে বুক কাঁপে। জীবনে আজ অবধি নিজের মনের কথাই শুনে এসেছে শীতানু। কারো নিষেধ মানার জন্য জন্মায়নি সে। তবে দাঁড়িয়ে কেন চুপচাপ?

সচেতন হতে চেষ্টা করল শীতানু। পারল না। পা বাড়াতে গিয়েও, সরিয়ে আনল আগের জায়গায় কেন কে জানে!

দেখছে, আসছে সুলভা।

দৃষ্টি শীতানুর চোখে। কি তীক্ষ্ন, চাওয়া যাচ্ছে না। শোনা যায়, বনের বাঘও নাকি এই রকম দৃষ্টির আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায়। মানুষ শিকার করতে গিয়ে শিকারীর হাতে এইভাবে ধরা পড়ে প্রাণ খোয়ায়। সব বুঝতে পেরেও পালাতে ইচ্ছে করছে না শীতানুর। একি হল তার? দু-চোখে ঘুম নামছে কেন? চোখের পাতার ওপর একমণি বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে কে যেন। পাতা দুটো কি ভারী হয়ে উঠছে। তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না আর।

সুলভার চোখে পলক পড়ছে না পলকের জন্য। এসে গেছে কাছাকাছি। দু'চোখের তারা দিয়ে নীল বিদ্যুৎ সরু হয়ে বেরিয়ে আসছে। দুটি বিদ্যুৎরেখা। শীতানুর দু'চোখের তারায় বিঁধছে। সারা অঙ্গ অবশ হয়ে যাচ্ছে। অত শক্তি গেল কোথায় তার? হাত তুলতে পারছে না, পা তুলতে পারছে না। ঠান্ডায় জমে পাথর হয়ে গেল নাকি সে? সুলভার দিক থেকে চোখ ফেরানোরও কোন ক্ষমতা নেই। দশটা হিম্মতের মানুষ হয়ে কি দুর্বলই না হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

ওই চোখে মায়ের চোখ ভেসে উঠেছে। মায়ের সঙ্গে কোন বিষয়ে অমত হলে, মা রেগে গেলে তাকাতো ঠিক এমনিভাবে। ঠিক এমনি নয়, কতকটা। এরকম জড়পদার্থ হয়ে যেত না শীতানু তার দৃষ্টিতে। এরকম অস্তিত্বহীন শক্তিহীনও হয়ে পড়ত না। মাকে দুটো ধমক দিয়ে, সামনে থেকে চলে যেতে পারত আদেশ অমান্য করার উদ্দেশ্যে।

মায়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি যা হয়েছে, মতের বিরুদ্ধে। তার ভালো মত মা মেনে নেয় নি কখনো। মাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে হয়রান হয়ে গেছে সে, তবু নিজের মতে আনতে পারে নি মাকে।

মা বলেছে, শীতানু, যে-পথ ধরেছিস, আমাকে নরকগামী হতে হবে দেখছি। বাইরে দুশমন কোথায়? পেটের দুশমনই সব চাইতে বড় দুশমন।

শীতানু বলেছে, দুনিয়া সুখে থাকবে, আর আমরা না খেতে পেয়ে মরবো—তোমার ভগবানের বিচার বলিহারি! যা করছি ভালো করছি। আমার বিবেকের কাছে আমি খাঁটি মানুষ। সাচ্চা-সন্ত। আমার ভগবান তুমিই। তোমার সুখের জন্য অন্যের সুখ কেড়ে নিলে, পাপ নেই কোন। নরক-স্বর্গ ওসব মন-গড়া। কিছু না, কিছু না।

—কিছু না থাকুক, তুই আছিস আমি আছি তো? লেখাপড়া শিখে, ডাক্তারি পড়ে দস্যু হলি—খুনী হলি? ও পয়সায় সুখী হতে চাই না আমি। ও পয়সার অন্ন-রুটি মুখে তুলতে পারবো না আমি! না খেয়ে মরি সেও ভালো। তুই একরকম হবি—আশা করি নি। সবই আমার বরাত।

মা বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

যাওয়ার সময় বলে গেছে, মানুষ হলে আসবো। অমানুষের মা—এ পরিচয় দেবার জন্য এখানে থাকা সম্ভব নয় আর আমার।

বাবা মারা যাওয়ার পর মা নিজের গায়ের গয়না—এক একটা করে বেচেছে। সংসার চালিয়েছে আর পড়িয়েছে। কই—কেউ তো কোন মদত করে নি তাদের। মদত করা দূরের কথা—একটা বিধবাকে না সাহায্য করার অপযশ মুছে ফেলার জন্য উল্টে মায়ের পবিত্র চরিত্রে কালি লেপে দিতে দাতার হৃদয় বেরিয়ে এসেছে তাদের। একটুও কৃপণ হয় নি কেউ।—মরদটার তো কোন মুরদই ছিল না। রেখে যায় নি কানাকড়ি। শীতানুর মা অত ঘটা করে পড়াচ্ছে কোত্থেকে ছেলেটাকে? দেখতে শুনতে তো মন্দ নয়। টাকার অভাব হবে কেন?

কথা যে শীতানুর কানে যায়নি, তা নয়। মাকে বলেছে, লোকেদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য হয় না আর। এদেশ ছেড়ে চলে যাই চলো। পড়ে-শুনে দরকার নেই আর আমার।

মায়ের স্থিরদৃষ্টি ছড়িয়ে পড়েছে শীতানুর মুখের ওপর। থেমে থেমে শান্তগলায় বলেছে, মাথা গরমের কাজ নয়। যারা যা-তা বলছে—তাদের দেখিয়ে দিবি—তুই কত বড়। কাপুরুষের মতো পালাবি?

তাদেরই সর্বনাশের জন্য উঠিপড়ি লেগেছে শীতানু। কাপুরুষের মতো পালায় নি, পালাবেও না। মা বুঝলো না। মায়ের মতো মিলাপীও অবুঝ।

মিলাপী কত শ্রদ্ধাভক্তি করতে তাকে বিয়ের আগে। তার সব কাজে উৎসাহ প্রেরণা যোগাতো কত। বিয়ের পর সেই মিলাপীর অন্য মূর্তি। সে ধনী হোক—মিলাপী চায় না। দিনরাত খিটিমিটি। বলে, এ ব্যবসা ছাড়ো তুমি। মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা এ বরদাস্ত করবো না কোনপ্রকার।

মিলাপীকে বোঝাতে কসুর করেছে নাকি শীতানু? ঢের বুঝিয়েছে। বলেছে, আমার মরণাপন্ন অসুখে কেউ কি একদাগ ওষুধ এনে দিয়েছে? দূর থেকে খবর নিয়েছে কেবল—প্রাণটা বেরুতে আর কত দেরী? কে বাঁচলো কে ম'লো—কোন দেখার দরকার নেই আমার।

মিলাপীর দু'চোখ মরা মানুষের চোখের মতো হয়ে গেছে। বলেছে, তুমি আমায় ছুটি দাও। আমি জানবো আমার বিয়ে হয় নি। একটা দুঃস্বপ্নকে সুস্বপ্ন ভেবে দুজনে কাছাকাছি এসেছিলুম! এখন দূরে সরার পালা।

—আমি বেঁচে থাকতে দূরে সরে যেতে দেব না তোমায়। রাগে উত্তেজনায় শীতানুর সারা শরীরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠেছে।

কেবল বাধা আর বাধা। সমস্ত কাজে বাধা দিতেই চেষ্টা করেছে মিলাপী। কিছু বললেই বলেছে, আমাকে আটকে রাখলে, এইরকমই হবে। তোমাতে আমাতে মিল হতে পারে না আর কখনো। দুজনের প্রকৃতি-মন সম্পূর্ণ আলাদা।

—আলাদা হলেও, স্বামীর মতই তোমার শিরোধার্য করা উচিত।

—স্বামী হওয়ার গুণ যে-পুরুষের মধ্যে একটুও নেই, সে স্বামীর দাবি করে কেমন করে? , কেমন করে আশা করে তার মতে মত দেবে অন্যে?

মিষ্টভাষিণী মিলাপী দুমুর্খ হয়ে উঠেছে তার ঘরে। শাসন বকাবকি করেও শায়েস্তা করতে পারে নি শীতানু।

দুঃসাহসিক কাজও করে বসছিল আজ মিলাপী।

বাড়ি ঢুকে হাসতে হাসতে বলেছে শীতানু, জ্যাঠার আদুরে রুগ্ন মেয়েটা আজ শেষ হয়ে গেছে। জাঠতুতো ভায়েরাও যাবে শিগগির। আজ আমার বড় আনন্দের দিন মিলাপী।

মিলাপীর মুখখানা থমথমে হয়ে উঠেছে। পায়ে পায়ে ঘরের কোণে সিলিণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেছে। ওদিকে কেন গেল বোঝার আগেই কার্বন-মনোক্সাইড ভরা সিলিণ্ডারের মুখটা খুলতে চেষ্টা করেছে। সর্বনাশের মাথায় পা! এ কি দুর্মতি মিলাপীর? লাফিয়ে কাছে গিয়ে, মিলাপীকে জাপটে ধরে সরিয়ে এনেছে দরজার দিকে।—একি করতে গেছলে তুমি? জানো—দুজনে খতম হয়ে যেতুম এখুনি।

—খতম হওয়ার জন্যেই তো খুলতে গেছলুম! অনেক মরেছে, আরো

মরবে তুমি বেঁচে থাকলে। তোমার পাপ কাজ থেকে মুক্তি দিতে হবে আমাকেই না হলে মরেও শান্তি পাব না আমি।

শীতানুর গলা দিয়ে বাজ পড়ার আওয়াজ বেরিয়ে এসেছে।—তুমি তো পালকের মেয়ে একটা। দুটো আঙুলের ব্যাপার। গলার নলিটা ধরবো আর ছাড়বো স্রেফ। কারো সাধ্যি নেই আমাকে দুনিয়া থেকে সরাতে পারে—যত শক্তিই থাকুক যার।

—কেউ না পারুক, আমি তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব।

শীতানু চমকে উঠল। একেবারে সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়েছে সুলভা। যুদ্ধং দেহি মূর্তি। মিষ্টিমধুর স্বর, কিন্তু শেল বেঁধানো কথা, বুক কাঁপানো শাসন।

স্ত্রীলোক দেখলেই শীতানুর মনে হয়, সে বীরপুরুষ। এই একটি মাত্র স্ত্রীলোকের কাছে আশ্চর্যভাবে ব্যতিক্রম ঘটছে তার। মনে হচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে।

সুলভা বলছে, তোমার কাজ তুমি বন্ধ কর, না হলে নিস্তার নেই। তোমার স্ত্রী হলেও, মেরে ফেলার তোমার অধিকার নেই। কেউ না জানুক, আমি জানি তোমার সমস্ত—তুমি কি কর, না কর। খানিক আগে একটা নিরীহ মেয়েকে খুন করে এসেছো, তার সঙ্গে আরো অনেককে। লুকিয়ে আর কোন কিছুই করতে পারবে না তুমি। সাবধান করে দিচ্ছি, নিজেকে ভালো করে গড়ে তোলো!

শীতানু বিস্মিত বিমূঢ়। কেমন করে ভেতরের সত্যি খবর জানতে পারল এই স্ত্রীলোক?

শীতানু বাড়িতে ফিরেছে। ফেরে নি মিলাপী। সুলভার সামনেই বলেছে, আমি ওর ওখানে যেতে চাই না আর।

হিংস্র পশুর মতো দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে শীতানুর। বীভৎস হয়ে উঠেছে মুখখানা। নিমেষে পাল্টে গেছে মানুষটা।

দুজনের মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়েছে সুলভা।

সুলভা বলেছে, তোমার ভয় হচ্ছে? কুকর্মের কথা সবাই জানতে পারবে—ও বলে দেবে। ভয় নেই। আমি ওকে কাছে রেখে দেব।

সুলভার মুখের ওপর কোন কথা বলতে পারে নি শীতানু। মাথা নিচু করে চলে এসেছে।

বাকি রাতটুকু পায়চারি করেই কেটেছে ঘরে। মনের মধ্যে দ্বন্দ্বের ঝড় বয়ে গেছে। প্রবল ঝড়, পথ হাতড়ে বেড়িয়েছে দিশেহারার মতো। কে এই স্ত্রীলোক—তার স্ত্রীকে নিয়ে গেল? জানাশোনা নেই, অথচ মনে হয়েছে কত-দিনের পরিচয়। কত দাবি তার ওর ওপর। যা বলেছে যা করেছে—কান

পেতে শুনেছে, মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। শান্তশিষ্ট ছেলের মতো এমন কাজ করেছে, এখন চেতনা আসতে বুঝতে পারছে, কি আহাম্মকিই না করেছে! ক্ষণেকের জন্য নিজের সমস্ত সত্তা লোপ পেয়েছিল তার। নিজের বলে কিছু ছিল না। ভাবতেও বিস্ময়। এ-ও কি মরুভূমির রহস্য-মোহ, না সত্যি কিছু আছে?

মনের ভ্রম কানের ভ্রম নয় তো? মিলাপীর ছায়াতে দেখে নি তো অন্য স্ত্রীলোক? তার নাড়ীনক্ষত্র জানে মিলাপী। মিলাপীর কথাই শুনেছে হয়তো ছায়ামূর্তির মুখ থেকে।

মরুভূমির রহস্যরাজ্যের সুযোগ নিয়ে মিলাপী তার চোখে ধোঁকা দিয়ে বালি ছিটিয়ে পালিয়েছে। শয়তানী মিলাপীকে খুঁজে বার করতে হবে যে কোন উপায়ে। তা না হলে সে ধরা পড়বে, তার দল-বল ধরা পড়বে।

খুনের পিপাসায় দু'চোখের কোণ রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে শীতানুর। ভেসে উঠছে বিষাক্ত গ্যাসে মিলাপীর নিষ্প্রাণ দেহ। নীল হয়ে যাচ্ছে যেন।

শীতানুর এটা কল্পনা করতে ভালো লাগছে। আত্মতৃপ্তি পাচ্ছে। এ ভাবটা মুহূর্তের জন্য ছিল, ভাবতে যেটুকু সময় লাগে। ভাবের ঘোরে ঘা পড়ল। কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো তর তর করে নিচে। দরজায় আঘাত হানছে কে! কে জানে। তার পরেই যার আসন—সেই যাদবলাল। অন্তরঙ্গ বন্ধু। শুধু অন্তরঙ্গ নয়, বিশ্বস্তও।

দরজা খুলে দেখল, একা যাদবলাল নয়, সঙ্গে আরো দুজন। ভকত সিং আর রামরতন। যাদবলাল যদি শীতানুর হৃৎপিণ্ড হয়, তাহলে এরা ডান হাত আর বাঁ হাত।

শীতানুর বিষণ্ণ মুখে একঝলক হাসি উপচে পড়েই মিলিয়ে গেল তাড়াতাড়ি। ইশারায় তিনজনকে ভেতরে ডেকেই দরজা বন্ধ করে দিল। উঠোনের ওদিকের ঘরটায় শলাপরামর্শ চলে। ওই ঘরেই নিয়ে গেল ওদের।

মাঝের চেয়ারে বসেছে শীতানু। সামনে টেবিল। টেবিল ঘিরে তিনজনে তিনদিকে। যেখানেই যে-কাজে যায়—এই তিনজনে এক সঙ্গে। গত রাতেও জ্যাঠার বাড়িতে গেছল ওরা। কার্যসমাধার পর, সঙ্গে করে এনে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে গেছে শীতানুকে। সকালে খবর দিতে এসেছে কার্যসিদ্ধি হয়েছে। ও ঘরে যারা ছিল—সকলে জগতের মায়া কাটিয়ে চলে গেছে।

শুনে মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল শীতানুর। অবাক হয়ে গেল বন্ধুরা। কোথায় হাসিতে ঘর ফাটিয়ে দেবে, ত নয়, গোমড়া মুখ। এমন তো দেখে নি ওরা কোনদিন।

কেমন কেমন ঠেকল যাদবলালের। কে জানে পুলিসের ভয় পেয়েছে কিনা! বলল, ভোর হতেই হৈ-চৈ চারিদিকে। জ্যাঠার বাড়ির খবর ছড়িয়ে

পড়েছে হু-হু করে। থানায় গিয়ে দেখল, দারোগাসাহেবের মাথায় হাত। এ দুষ্কর্মের, এ ঠান্ডা মাথায় নির্মম খুনের হদিশ পাচ্ছে না কেউ। দারোগা-সাহেবের বক্তব্যে অসহায় লোকের উক্তি।

অদ্ভুত খুন, অদ্ভুত ডাকাতি।

মানুষগুলো বিষাক্ত গ্যাসে মরেছে। কি করে গ্যাস আসছে এক এক বাড়িতে, কোথা থেকে আসছে, কারা আনছে, না আপনা হতে এক একটা বাড়ির এক একখানা ঘরে গ্যাস সৃষ্টি হচ্ছে—কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সকলে আতঙ্কে আতঙ্কে আছে। কে জানে কখন কার জীবন-প্রদীপ নিভে যায়—পরমায়ু ফুরোয়। দারোগাসাহেবের দুশ্চিন্তায় চোখের ঘুম গেছে। তার জীবন যায়, দুঃখ নেই, তার বিবি আর ছেলেকে কোথায় পাঠালে নির্ভয় হতে পারে, নিশ্চিন্ত হতে পারে—ঠিক করে উঠতে পারছে না।

অনেকের জিজ্ঞাসার উত্তরে একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে ঊর্ধ্বে দৃষ্টি মেলে দিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলেছে, কি জানি ভাই রামজী-দেবীজীর কি ইচ্ছে। কোন দৈব-টৈব বিরূপ হয়তো এ দেশের ওপর। এতদিন চাকরি করছি, এমন কান্ড তো দেখি নি কোনদিন। আরে আমরা কোন ছার, বাপঠাকুরদাও দেখে নি। হাসি চাপতে পারল না আর যাদবলাল। হো-হো করে হেসে উঠল জোরে। খিক খিক করে হাসছে রামরতন আর ভকত সিং।

শীতানু হাসল না। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির সরু রেখাটাও উঁকি মারল না একটি ক্ষণের জন্য। ভরাট গলায় শীতানু বলল, হাসির কিছু নেই আর। আমাদের আজ বড় দুঃখের দিন। সম্মুখসমরের জন্য প্রস্তুত হতে হবে আমাদের। বিপদ এগিয়ে আসছে।

তিনজনে গালে হাত দিয়ে বসে। কি বিপদ জানার আগ্রহে মুহূর্ত গুনছে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে পড়েছে ওরা।

অবসান হল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার। ঘরের মধ্যে বাজ পড়ল যেন। শীতানু বলল, আমরা ধরা পড়বো। মিলাপী পাঠিয়েছে, ওই-ই ধরিয়ে দেবে। বাইরে থেকে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে কে। এ ঘরের দরজা নয়, সদর দরজা। চারজনে চনমন করে তাকাতে লাগল। আওয়াজ থেমে গেল।

শীতানু বলল, সিলিন্ডার ঠিক করে নাও যাদবলাল। রামরতন ভকত সিং তৈরি থাকো। ছাদে উঠে দ্যাখো কে। গোটা বাড়িটা বিষাক্ত গ্যাসে ভরে পালাবো আমরা। সোনা-জহরত ঠিক করে রাখো। যে যার মুখে মুখোশ লাগাও।

রামরতন ভকত সিং ছাদে উঠেছে, দোতলার বারান্দায় জাফরির ফাঁকে চোখ রেখে রেখে দেখেছে। একজন ছাড়া আর কাউকে নজরে পড়ে নি। একটি মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে আছে শমীগাছের তলায়। শীতানুকে জানিয়েছে ওরা।

রাতের স্মৃতি ভেসে উঠেছে শীতানুর। সেই স্ত্রীলোক। পরে যাকে ভেবেছিল শীতানু—মিলাপীর ছায়া। ছায়া নয়, জলজ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষ।

এসেছে আবার কি মতলবে। পুলিসের গুপ্তচর নয়তো? হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

সকলকে রাতের সমস্ত কাহিনীই বলল শীতানু। তার নিজের মতিগতি পরিবর্তনের কথাও বলল।

ওরা শুনে তাজ্জব। এমন কি শক্তি থাকতে পারে একটা মেয়েছেলের মধ্যে যে, মানুষের মন ঘুরে যায়, নিজেকে ভুলে যায় মানুষ, সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে? শীতানু হুঁশিয়ার করে দিল ওদের। বলল, ওকে ভেতরে নিয়ে এসে বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে দিতে হবে। একটা কণ্টক যাবে আমাদের। মিলাপীকে আজই খুঁজে বার করতে হবে। যে গ্যাস ছাড়বে, যেন ওর সামনে না যায়। ওকে দেখলে যদি কিরকম হয়ে যায়—সেই ভয়। গ্যাস ছাড়ার ভার রামরতনের ওপর। ওকে অনুসরণ করে যদি আড়ালে আড়ালে পুলিসের লোক লুকিয়ে থাকে—বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার আমাদের। বলল যাদবলাল।

—তুমি এত ভাবছো কেন? বাছাধনদের ফিরতে হবে না আর এখান থেকে। এক একটা সিলিণ্ডারই আমাদের মোক্ষম অস্ত্র। গোটা দেশটাকে শেষ করে দিয়ে তবে যাবো আমরা। বলে, শীতানু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। দরজা খুলে দেবে, ভেতরে ডাকবে স্ত্রীলোকটাকে। ভেতরের ব্যাপার দেখার উদ্দেশ্যে, জানার উদ্দেশ্যে আসার লোভ সংবরণ করতে পারবে না স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তাদের অনায়াসে।

দরজা খুলতেই সুলভার সঙ্গে চোখাচোখি হল শীতানুর। সুলভার ঠোঁটে মৃদু হাসি। শুভ্র সুন্দর চেহারা। মাথা ভর্তি রুপোলী চুল, দু-কাঁধ জুড়ে দোল খাচ্ছে ফুরফুরে ভোরের হাওয়ায়। সূর্য উদয় হয়নি। আকাশে ফিকে লালের আভা ফুটে উঠছে।

বেজার মুখে শীতানু ডাকল ভেতরে।—আসুন। দরকার আছে নিশ্চয়?

—আছে, অনেক কথা।

সুলভা নির্দ্বিধায় প্রবেশ করল বাড়ির ভেতরে। বুঝতে পারা গেল, ভেতরে আসার জন্যই এসেছে। শীতানুর গতরাতের ব্যামো এসে উপস্থিত হচ্ছে আবার সুলভাকে দেখে। কেমন হয়ে যাচ্ছে। মনের জোর ঠিক রাখতে চেষ্টা করছে, পণ্ডশ্রম হচ্ছে। আবার সেই মোহ, পরিচিত মনে হওয়া, শোনা গেল, চেনা চোখ, নিজে শিশু।

সর্বনেশে ব্যাপার। শীতানু মনে মনে বলছে, আমার দুর্দান্ত প্রতাপ। আমি সর্দার। স্ত্রীলোক গুপ্তচর, বিষাক্ত গ্যাসে ওর মৃত্যু অনিবার্য। ওর ওপর কোন দয়া নয় মায়া নয়। নিপাট নির্দয়।

শীতানুর মনের কথা কেড়ে নিয়ে বলল সুলভা, আমি তো মরার জন্য আজ এসেছি এখানে। মনে মনে কোন কিছু আওড়ানোর দরকার নেই তোমার।

শীতানু দেখছে, কালকের সেই নিষ্পলক চাউনি। সহ্য করতে পারছে না। তার সিলিন্ডারে যে বিষ, এর চোখ কি সেই বিষে ভরপুর ?

ভকত সিং যাদবলালের ইঙ্গিতে দৌড়ে এসে, শীতানুকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। ঝটপট পরিয়ে দিল মুখোশটা মুখে। চলল সিলিন্ডারে কাজ। বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ল আঙিনায়। চোখ বুজে ধীর স্থির দাঁড়িয়ে রইল খানিক সুলভা। তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে।

চার বন্ধু হতভম্ব হতবাক। নির্ঘাৎ মৃত্যু থেকে বেঁচে ফিরে গেল কি করে ? একি যন্ত্রের মানুষ, না কোন অশরীরী আত্মা ? যাই হোক, অনুসরণ করতে হবে ওকে।

চারজনে অনুসরণ করে চলেছে একসঙ্গে। যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে যাচ্ছে। সুলভা থামলো যে বাড়ির দরজায়—একতলা। বাড়ির দরজা জানলা সব খোলা। ময়ূর বেড়াচ্ছে দল বেঁধে। মানুষের মতো শীতানুদের দেখে পাশ কাটিয়ে সরে গেল। মনে মনে কোন ভয়ডর নেই। দু'দিকে দুটো বাবলাগাছ দাঁড়িয়ে আছে।

এতক্ষণ আপন মনে চলে এসেছে সুলভা। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে। পেছু ফিরে তাকায়নি একবারও। বাড়িতে প্রবেশের মুখে, পাথরের সিঁড়ির ধাপে বাঁ পা রেখে ঘুরে দাঁড়াল। হেসে বলল, আমি মরিনি, আমি ভূতও নই। তোমাদের কোন ভয় নেই। ধরা পড়ারও না। আমার কথায় বিশ্বাস করে ভেতরে আসতে পারো।

কথার যে এমনতর আকর্ষণ থাকতে পারে,—ওরা জানতো না কেউ। সুলভার সঙ্গে ওরা কলের পুতুলের মতো ভেতরে ঢুকলো।

ডানপাশের ঘরের মেঝেয় একটা সতরঞ্চির ওপর গেরুয়া চাদর বিছানো। সুলভা বসতে বলল ওদের। দেয়াল ঘেঁষে লাল কম্বল পাতা। কম্বলের ওপর এসে বসল সুলভা নিজে। কি যেন কি চিন্তা করল, প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল একবার করে। একটা কিছু ভালো করে দেখে নিল যেন। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু।

চার বন্ধুর অস্বস্তির একশেষ। না পারছে উঠতে না পারছে বসে থাকতে।

লক্ষ্য করল সুলভা। মোলায়েম গলায় বলল, অত ছটফট করছো কেন ? চুপ করে বসে থাকতে পারছো না ?

সুলভা যেন মন্ত্র পাঠ করে শান্তিবারি ছিটিয়ে দিল ওদের মাথায়। চারজনের চঞ্চলতা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা মন্ত্রমুগ্ধ, ওরা ধীরস্থির। তপোবনে ঋষিবালকরা বসে আছে যেন। সুলভা সাক্ষাৎ সরস্বতী। জ্ঞান দিচ্ছে ওদের। সুলভা বলছে, অন্যায় পথে যাওয়ার ইচ্ছে হলে, সে পথ খুঁজে পাওয়া যায় যেমন, ন্যায় পথে চলার ইচ্ছে হলে, সে-রাস্তায়ও পৌঁছুতে পারে এই মানুষই। হতাশায় ভেঙে পড়লে চলে না। তোমাদের রাস্তা ঠিক নয়।

তোমরা সোনার চাঁদ ছেলে। তোমাদের মধ্যে যে মানুষকে দেখতে পাচ্ছি আমি, সে মানুষ ভবিষ্যতের মঙ্গলময় পুরুষ। যে মানুষ কারো প্রাণ কেড়ে নেবে না। প্রাণ রক্ষা করবে বরং আরো সকলের। সে মানুষ কোন কিছু ধ্বংস করবে না। সদাসর্বদা স্থিতি করে রাখার চেষ্টা থাকবে তার। আমার কথা শুনলে তোমাদের সেই মানুষকে দেখতে পাবে তোমরা। দেখবে দূরের জিনিস, দেখবে প্রত্যেকের অন্তর। দেখবে নিজেদের অতীতের ছবি।

থামল সুলভা। দেখল, তন্ময় হয়ে শুনছে ওরা, শীতানু বেশি তন্ময়। শীতানুকে প্রশ্ন করল, আমি যা শেখাবো শিখতে চাও? বিষের গ্যাসেও বেঁচে ফিরে আসতে পারে মানুষ। আমাকে তো স্বচক্ষে দেখলে তোমরা। মৃত্যুর শক্তির চেয়েও জীবনের শক্তি বেশি জানবে। সে-শক্তি নিজেদের মধ্যেই রয়েছে, জাগিয়ে তুলতে হবে।

শীতানুর সঙ্গে অন্য তিনজনও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে, শিখবে।

উঠে দাঁড়িয়েছে সুলভা। বলেছে, তিনদিন সময় দিলুম তোমাদের। অপরের মৃত্যুতে নিজেদেরই মৃত্যু হবে, অপরে বাঁচলে নিজেরাই বাঁচবে তোমরা। তিনদিন ধরে তোমাদের মন থেকে খুনের নেশাকে মুছে ফেলার জন্য নিজের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলবে কেবল—আমরা খুনী নয়, খুন করার জন্য জগতে আসিনি। এসেছি সকলকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

ডেরায় ফেরার পর মহাসমস্যায় পড়ল শীতানু। কি করবে, কোন্ দিকে যাবে? যতক্ষণ সুলভার চোখের সামনে ছিল, আর একটা দুনিয়া ভুলে ছিল, তার নিজের দুনিয়া! সেই দুনিয়ায় এসে গেছে আবার। মানুষের ওপর সমাজের ওপর বিদ্রোহী মন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আবার। সমাজ মানুষ যে ব্যবহার করেছে তার ওপর, তার মায়ের ওপর, ক্ষমা নেই।

দুম দুম করে চলতে চলতে ধপাস করে বসে পড়ল শীতানু চারপাইয়ের ওপর। অপর একটা চারপাইয়ে তিনজনে বসে গায়ে গায়ে। যাদবলাল রাম-রতন ভকতসিং।

বাইরে ঝাঁঝালো রোদ্দুর। বাতাস গরম হয়ে উঠছে। বালি তেতে আগুন। সাদা সূর্যের নীল আলোয় লাভাস্রোত বইছে। রামরতন উঠে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিল ভালো করে। বাইরের বাতাস ঘরে যাতে না ঢোকে।

মাটির সুরাই থেকে কাঁসার গেলাসে জল ভর্তি করে, ঢকঢক করে গলায় ঢালল। বন্ধুদের দিকে তাকাল একবার। জলের প্রয়োজন আছে কিনা। ইশারায় জানাল ওরা—প্রয়োজন; ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

যদিও কুঁজোর জল ঠাণ্ডাই ছিল, গরম হয়ে ওঠেনি এখনো, তবুও ভেতরটা ঠাণ্ডা হল না শীতানুর। জ্বলে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হচ্ছে না কিছুতেই।

আজ পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে পড়েছে। ভুলতে পারছে কই ছোটবেলার

দুঃখ-দুর্দশার কথা? ভুলতে পারছে কই সকলের হেনস্থার কথা? কেন ভুলবে শীতানু? জীবন থাকতে ভুলবে না। ভুললেই তো অন্যপক্ষের জিত আর তার হার।

স্ত্রীলোকটি হতে পারে সন্ন্যাসিনী কি যোগিনী। পরনে গেরুয়া আলখাল্লা। ঘরটায় ঠাকুরদেবতার ছবি সাজানো। মানুষের ছবিতে নিচু থেকে মাথা অবধি পর পর ক'টা পদ্ম আঁকা। তলায় যোগী বলে কিসব লেখা রয়েছে।

তাতে কি এসে যায় তার! ওর কথা শুনতে হবে – এমন কোন দাসখত লিখে দিয়ে আসেনি তো। যাবে না, ওসব শিখবে না। তার কাজ সে করে করে যাবে। স্ত্রীলোকটির কাছে যেতে থাকলে সকলের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সব উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যাবে তাদের।

শীতানু বলল. আমরা যাবো না। আমার হাতে হাত মেলাও তোমরা।

যাদবলাল বলল, একটা কথা চিন্তা করে দেখো সর্দার।

—চিন্তা মানেই তো এসব ছাড়া। না, কোন চিন্তা করবো না আমরা আর। —এসব ছাড়ার কথা ভেবেছো কেন? এসব তো ছাড়া হবেই না। বরং মস্ত সুবিধে হবে ওর কাছ থেকে বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচার উপায়টা শিখে নিলে। মুখোশ পরতে হবে না। গ্যাসে সবাই মরবে, অথচ আমরা বহাল তবিয়তে গ্যাসের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবো।

শীতানুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। চোখে হাসি। সর্বাঙ্গে হাসির ঢল নামছে। দেহটা দুলে দুলে উঠছে।

সর্দারের মনে লেগেছে যাদবলালের কথা। যাদবলাল খুশী। হাসি তারও চোখে মুখে। হাসছে রামরতন, হাসছে ভকত সিং। তিনজনে চারপাই থেকে উঠে এসে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল শীতানুর হাতের দিকে। শীতানু দাঁড়িয়ে উঠল। প্রথমে যাদবলালের হাতখানা চেপে ধরে ঝাঁকানি দিল একটা, তারপর রামরতনের, তারপর ভকত সিংয়ের।

তিন দিন সময় দিয়েছিলো সুলভা।

তর সয়নি শীতানুর। পরদিন ভোরে এসে হাজির। ঘুমভাঙা পাখি বাবলা গাছের ডালে ডাকছে তখন। কাজল চোখের হরিণ একটা বাচ্চা নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। আগের দিনের মতো ময়ূর-ময়ূরীরা বেড়াচ্ছে না, সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে আছে পাশাপাশি। জোড়ায়-জোড়ায় একাত্মা যেন।

আজ আর পাশ কাটিয়ে সরে গেল না। একবার করে মুখ তুলে চেয়ে দেখেই, চোখ বুজে ঠোঁট গুঁজে দিল পিঠের রেশম-নরম পালকে। ভাবখানা— তোমাদের তো দেখেছি কাল। মাঝখান দিয়ে চলে যাও না। সিঁড়ির তো দু'ধারে আমরা।

সুলভা বসে ছিল ঘরে নিজের জায়গায়। দরজার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে

ছিল, যেন শীতানন্দের অপেক্ষায় বসে। মুখেও বলল তাই, জানতুম তোমরা আসবে। ঠিক করলে কি?

শীতানু চুপ। কোন উত্তর দিল না। সুলভা চেয়ে রয়েছে। যাদবলালই জবাব দিল।—আমরা ওসব পথে যাবো না। আপনার কাছে শিখব বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচার উপায়। ওটা আগে না শিখলে, বিপদে পড়তে পারি। শত্রু অনেক। ছেড়ে দিয়েছি জানতে পারলে, কখন কে কি করে বসে—দারুণ ভয়।

সুলভা সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেতরটাও দেখে নিল বুঝি। ঠোঁটের ফাঁকে চাপা হাসি ফুটতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। বলল, বেশ। তবে একটা শর্ত—এই বিদ্যা শিখে যদি অন্যায় কাজে লাগাও, তাহলে কিন্তু আমার কাছ থেকে—আরো যেসব অনেক ভালো জিনিস পেতে—সেগুলি আর পাবে না। কোন জিনিস তো আর পাবেই না, সেই সঙ্গে আমাকেও না। তোমাদের জন্য তোমাদের সামনেই আমি নিজেকে শেষ করে ফেলবো।

একটু চঞ্চল হয়ে উঠল ওরা। শীতানু তো বোবা একেবারে, রামরতন বলল, আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন।

—তোমাদের আমি বিশ্বাস করি।

নিশ্বাস টানা নিশ্বাস ছাড়া নিশ্বাস বন্ধ রাখা—সমস্তই সংখ্যার ওপর, মাত্রায় —ক'মাত্রা করে কোন্‌টি, আঙুলে কর গুনে গুনে দেখিয়ে দিয়েছে সুলভা।

বলেছে, নিশ্বাস টানা 'পূরক', ছাড়া 'রেচক' আর ধরে রাখা 'কুম্ভক'। অভ্যেস করতে করতে অনেক সময় পর্যন্ত কুম্ভক করা যায়। কুম্ভকে বাইরের কোন গ্যাস ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। তবে 'জালান্ধর মুদ্রা' দরকার। জিবের ডগা টাগরায় ঠেকিয়ে চিবুক বুকে আটকে রেখে কিছুক্ষণ করে থাকা। যে কোন জীবাণুর আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে ওঠে এ মুদ্রায়। আর মেরুদণ্ডর শেষে চারটি পাপড়ির পদ্ম চিন্তা। ওটি 'মূলাধার চক্রে'র পদ্ম। পদ্মের মধ্যিখানে নিজে বসে আছি। জ্যোতির দেহ।

ওদের বিদায় করে দিয়ে সুলভা একা ঘরে বসে রইল। দেখছে আকাশ, খোলা জানলায় বসে আছে একটা হলুদ পাখি। টুকটুকে লাল ঠোঁট, কিচিরমিচির করে পাখা কাঁপিয়ে উড়ে চলেছে। পাখিটা যেন একটা আলোর পাখি হয়ে গেছে।

পাখির ওড়া দেখিয়েই আত্মানন্দ যোগের পাঠ শিখিয়েছিল সুলভাকে। বাবার গুরু পরিব্রাজক আত্মানন্দ।

আত্মানন্দর কাছে সুলভা যখন যায়, সেদিনটা সুলভার জীবনমরণের দিন। আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছেই পেয়ে বসেছে বেশি করে।

স্বামীর সঙ্গে মনোমালিন্য চরমে পৌঁছেছে। শীতানুর প্রকৃতি ছিল স্বামী অম্লানের। শীতানুর যেমন বিষাক্ত গ্যাস, অম্লানের তা ছিল না। ছিল বন্দুক, ছিল ধারালো ছোরা। দুজনের রুজিরোজগারের উদ্দেশ্য কিন্তু এক।

লুটপাট আর মানুষ খুন। মিলাপীর মতো নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছে সুলভা অমিলানকে। ফল হয়নি। ব্যর্থ চেষ্টায় নিজের জীবনের ওপর বীতস্পৃহ হয়ে পড়েছে।

শুনতে পেল বাবার গুরুদেব এসেছে। তিব্বতে যাবে এখানে কিছুদিন থাকার পর। মহাজনের আশীর্বাদে যদি ফেরে অমিলান তো ভালো, না হলে আত্মঘাতী হবে সে।

আশীর্বাদ নিতে গেছে আত্মানন্দের কাছে এদেশের মেয়ে সুলভা, এদেশেরই বৌ, তবু পথ চলতে সমস্ত নতুন মনে হয়েছে। জায়গা রাস্তা গাছপালা—সব। এমন কি নিজেকেও।

যোগী আত্মানন্দ এক দৃষ্টিতেই তার মনের অন্ধিসন্ধি পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়। কথার থাকে থাকে সহানুভূতির ভিত সাজানো ছিল তার। মিষ্টি হেসে বলেছিল, মরা তো এক মুহূর্তেই যায় রে। ওর জন্য অত তৈরী হতে হয় না। না ডাকলে যে আসে, আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে, তাকে অত ডাকাডাকি কেন? তুমি এসো মৃত্যু, এসো, এসো! পাগলী কোথাকার! বেঁচে থাকলে যে অনেককে বাঁচাতে পারবি রে।

—একটা মানুষকে ফেরাতে পারলুম না, আর বাঁচাতে পারবো অনেককে! ক্ষোভ-অভিমান দুঃখে কথাটা বলে ফেলেছিল সুলভা।

পরে নিজেকে সামলে নিয়ে, নাক-কান মলে বলেছে, ধৃষ্টতা মাপ করবেন। সবই তো বুঝতে পারছেন। বড় জ্বালায় জ্বলছি।

আত্মানন্দ বলেছিল, শান্তি-আনন্দ নিজের ভেতরে, নিজের শক্তিকে না চিনলে, না জাগিয়ে তুললে, অপরের শান্তি-আনন্দের শক্তিকে কেমন করে জাগিয়ে তুলবি? নিজেকে চেন আগে, তারপর চিনতে পারবি সকলকে। দেখতে পাবি সকলের ভেতর। কেমন করে কাকে ঘোরানো যায় ফেরানো যায়—অসাধ্য থাকবে না তোর কাছে আর।

আত্মানন্দের পা জড়িয়ে ধরে আর ছাড়েনি সুলভা। বলেছে, সংসার করা খুব হয়েছে আমার বাবা। আর দরকার নেই।

হেসে বলেছে আত্মানন্দ, বেটি! তুই সংসার করতে আসিসনি। এসেছিল অন্য কাজের দরুন। পরে দেখবি, জানতে পারবি সমস্ত। তুই তো যোগিনী হয়েই জন্মেছিস। তোর আসল পথ যোগসাধনা। তোর নামটাই দেখ না। এ নাম রাখা হল কেন? যে-ই রাখুক—তার মুখ দিয়ে তার অগোচরেই এ নাম বেরিয়ে গেছে।

আত্মানন্দ সুলভার কপালের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বলল, সুলভা কে ছিল, বলি তোকে শোন্।

রাজ-বংশেরই মেয়ে সুলভা। মনোমত স্বামী না পাওয়ার জন্য বিয়েই করল না। যোগসাধনায় বিলিয়ে দিল নিজেকে। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিল

সুলভা। মিথিলার রাজা জনক—তখনকার দিনে খ্যাতনামা যোগী-ঋষি-সাধক—লোকের শিক্ষাদাতা। পরীক্ষা করার জন্য গেল সেই সুলভা। নিজের চিত্ত মন নিজের বুদ্ধি-দৃষ্টি জনকের চিত্ত-মনে বুদ্ধি-দৃষ্টিতে বসিয়ে সুলভার ইচ্ছেকে জনকের ইচ্ছে করে তুলেছিল। তুইও নিজেকে তৈরি করে নিয়ে নিজের শুভ ইচ্ছেকে অন্যের শুভ ইচ্ছে করে তুলবি।

সেদিন সুলভার বুক ভরে উঠেছিল স্বর্গীয় আনন্দে।

মূলাধার চক্রে নিজেকে দেখার চিন্তা করতে বলেছিল আত্মানন্দ। পাখি যেমন আকাশে উড়ে চলে যায়, যে পাখিটা উড়ে যাচ্ছে চেয়ে দেখ ঠিক ওইভাবে নিজেকে চিন্তায় সর্বত্র নিয়ে যেতে হবে। দেখবি, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কত কি দেখতে পাচ্ছিস তুই। তোর স্থূল দেহটা বসে থাকবে আসনে বটে, কিন্তু এক হয়েও বহু তুই ঘুরে বেড়াবি সূক্ষ্মভাবে। শত শত সুলভা।

আত্মানন্দের সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরেছে সুলভা। আত্মানন্দের যোগসাধনা-সিদ্ধিলাভ রক্তমজ্জায় মিশে গেছে তার।

একসময়ের বালিকা যৌবনের তরুণী আর নেই সুলভার মধ্যে। যে আছে সে প্রৌঢ়া। সন্ন্যাসিনী, রাগদ্বেষহীন অপর্যাপ্ত মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ সমুদ্র-প্রমাণ একখানা মাতৃহৃদয়।

দীর্ঘদিন পর ফিরল জয়সলমিরে। সব বদলেছে। বদলায়নি কেবল মানুষের মন। অমিলানকে ফেরাবে কি—অমিলান ওপারে। সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

তিব্বতে বৌদ্ধমঠে আত্মানন্দের সঙ্গে যে ক'দিন ছিল, লামা সুতংয়ের নির্দেশে যে ধ্যান করেছে, প্রতিদিনই একখানা মুখই ভেসে উঠেছে তার ধ্যানে বিশেষ করে। সে মুখ শীতানুর।

এখানে ফিরে শীতানুকে দেখতে পেয়েছে একদিন তার বাড়ি ঢোকার সময়। অবাক হয়ে গেছে, হুবহু সেই মুখ—ধ্যানের সময়কার।

আবার ওই মুখই শুধু ভাসেনি ধ্যানে, ভেসে উঠেছে ওর কীর্তিকলাপ। ঠাণ্ডা মাথায় বিষাক্ত গ্যাসে খুন! দেখে, থাকতে পারেনি আসনে বসে। উতলা হয়ে উঠেছে। গেছে শীতানুর বাড়িতে। শোধরাতে হবে ওকে।

ওরা যোগ শিখবে, শোধরাবে। কি মনে করে, নিজে নিজেই জোরে হেসে উঠল সুলভা।

এত বেশি অনুশীলন করতে নিষেধ করেছে সুলভা। বলেছে, যোগের ব্যাপার হুড়মুদুড়ুম করলে হয় না। হিতে বিপরীতই হয় শেষে। এসব রয়ে-সয়ে ধীরে ধীরে। চার বন্ধুর কেউই কর্ণপাত করেনি কথায়।

ওরা ভেবেছে, যা আদায় করার—করা হয়ে গেছে সুলভার কাছ থেকে। সুলভাকে ওদের কোন প্রয়োজন নেই। ওর কথা গ্রাহ্য করার দরকার নেই।

অনুশীলন চলল রাতে-দিনে।

মাসখানেক কেটেছে। ওরা মহড়া দেয়ার জন্য প্রস্তুত হল। পরীক্ষা করে দেখতে হবে। মিলাপীর বাপের বাড়িতেই হয়ে যাক। দুশমন মিলাপীর বাপের বাড়ির কাউকেই আর জ্যান্ত রাখা হবে না। প্রতিশোধ নেয়া কাকে বলে, মিলাপী হাড়ে হাড়ে টের পাবে। শীতানুই মতলবটা দিল তার সাকরেদদের।

গহিন রাত।

শীতানু বেরিয়ে পড়ল তিন বন্ধুকে নিয়ে। বালির ঘূর্ণিটা এখনো চলেছে চোরাবালির টিলার দিকে। বাতাসে একটানা গোঙানি আওয়াজ উঠছে। এমন প্রায়ই হয়। আজ যেন একটু বেশি বেশি। মরুভূমিকে প্রেতপুরী মনে হচ্ছে।

বাতাস ঘূর্ণির দিকেই টানছে ওদের। বিপরীত পথ ধরে দৌড়ল ওর।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল চারজনে। পথ আগলে দাঁড়িয়ে সুলভা। সুলভা বলল, তোমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ। শর্ত ছিল কি? আবার খুন, আবার লুটপাট করতে বেরিয়েছো। আমার প্রতিশ্রুতি আমি রাখবো। নিজে শেষ হওয়ার আগে, একটা কথা বলে যাবো—তোমরা সত্যিই এক একটা রত্ন হয়ে উঠবে!

মৌনমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে চারজনে।

বালির ওপর বসে পড়ল সুলভা। বসা দেহ পড়ে গেল। ধরে তুলতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল শীতানু। সমস্ত শরীরটা হিমপাথর। প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। নিশ্বাস পড়ছে না, বুকের ধুকধুকুনি বন্ধ, নাড়ী নেই হাতে।

শীতানুর বুকের তলায় একটা বোবাকান্না মাথা কুটতে লাগল। মনে হচ্ছে, সুলভাকে হারিয়ে সব হারাল সে। শুধু হারাল নয়, সুলভার মৃত্যুর সঙ্গে নিজেরও মৃত্যু হল যেন।

সুলভার কথা কানে বাজছে শীতানুর।—অপরের মৃত্যুতে নিজেদেরই মৃত্যু হবে, অপরে বাঁচলে নিজেরাই বাঁচবে তোমরা।

প্রত্যেকে ওই একই কথা শুনছে। সকলের চোখে জল! সুলভার সঙ্গে শীতানুর কোথায় যেন একটা যোগ ছিল, তা না হলে ভেতরে এত হাহাকার উঠছে কেন? কই—অন্য কারো জন্য তো এমন হয়নি।

শীতানু আদেশ দিল যাদবলালকে—বিষাক্ত সিলিণ্ডার—একটাও যেন না থাকে—ফেলে দাও চোরাবালির ঘূর্ণিতে।

বালিজমিতে শুয়ে আছে সুলভা। মনে মনে বলল শীতানু—তোমার উপদেশই মাথায় পেতে নিলুম আমরা! আত্মা আছে কিনা জানি না, তোমার আত্মা দেখতে পাবে কিনা জানি না, আত্মা না থাকুক, কিন্তু আমরা আর বেইমান হব না।

চোরাবালির ঘূর্ণির দিকে নিজেও একটা সিলিণ্ডার গড়িয়ে দিল শীতানু। ঘুরতে ঘুরতে মরুর অতল তলে তলিয়ে গেল সিলিণ্ডার চক্ষের নিমেষে।

পেছন ফিরে তাকাতেই চারজনে চমকে উঠল। বসে আছে সুলভা। হাসছে।

ওরা দেখছে একদৃষ্টে। সুলভার প্রেতাত্মা নয় তো? কাছে এগোচ্ছে না কেউ। তফাতে দাঁড়িয়ে আছে স্থাণুর মতো।

সুলভার ভেতরে পরমতৃপ্তিতে ভরভাঁত হয়ে উঠেছে। তার উদ্দেশ্য সফল, সাধনা সিদ্ধি। নাড়ী-নিশ্বাস দেহের সমস্ত যন্ত্র অচল করে রেখেছিল যোগে—ওদের ফেরানোর জন্য। ফিরেছে ওরা।

ফেরার হদিশ আগে থেকেই দিয়েছিল সুতং লামা। তখন আত্মানন্দর সঙ্গে মানস সরোবর দেখতে যাচ্ছে সুলভা। এত ঠাণ্ডা, সে আর কহতব্য নয়। বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে। বরফের রঙে বড় বড় বলের মতো ফুল ফুটে রয়েছে এদিকে ওদিকে।

সুতং লামা বলল, জোরোওর সিংয়ের সমাধি দেখবি না?

সুলভার মনে মনে হচ্ছিল, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। যে ছেলে ভারতের রত্ন—তার সমাধি না দেখে তীর্থ থেকে ফেরা মানেই তো তীর্থযাত্রা নিষ্ফল। তিব্বতে এসে লাভ কি হল তাহলে?

১৮৪০ খৃস্টাব্দে রাজা রণজিৎ সিংয়ের মৃত্যুর পর, জোরোওর সিংই লাদাখ থেকে তিব্বত আক্রমণ করে। বীরের মতো যুদ্ধ করেছিল। বিরূপ প্রকৃতি বাধ সেধেছে, চতুর্দিকে বরফ জমতে লাগল। সৈন্যরা জমে গেল। তবু জোরোওর সিং প্রাণপণে লড়েছে। মরেও বেঁচে আছে। বীরের শ্রদ্ধা জানিয়েছে ওদেশের লোক। তারই চিহ্ন তার সমাধি।

সুলভার কাছে ও সমাধি পবিত্র দেবতার পীঠস্থান।

সমাধি দর্শন করে, মাথা ছুঁইয়ে প্রণাম জানাল সুলভা।

ব্যথা গলে দু'চোখের কোণে টলমল করছে।

সহানুভূতির সুরে সুতং লামা বলল, দুঃখের কি আছে? এমন একটা ছেলের মা হতে চাস তুই? ছবি, তোর ছেলে মানুষ হবে। ফিরবে।

ফেরাবি তুই-ই ওকে!

মাথায় বজ্রপাত হল সুলভার। মহাপুরুষ সর্বজ্ঞ—এ কেমন কথা বলল? বিবাহিত জীবনেও কুমারীই তো ছিল সে। স্বামী নিয়ে সংসারটা হল কই? তার ছেলে! এখন তো সন্ন্যাসিনী। সাধুও এমন ব্যঙ্গ করতে পারে?

সুলভার দু'চোখে বিস্ময়। ঠোঁট কাঁপছে। বলতে যাচ্ছে, এই আপনি সাধক? বলা আর হল না। হেসে গড়িয়ে পড়া যাকে বলে, তাই। সুতং লামা হাসতে হাসতে বলল, অন্যায় কিছু বলিনি। তোরই ছেলে। আমি নিয়ম বলে দিচ্ছি। ধ্যান করে দ্যাখ্ না তুই—কে? তোর আগের জন্ম দেখতে পাবি।

সন্দেহ-অবিশ্বাসের দোলায় সুলভার মন সাংঘাতিক ভাবে দুলে উঠেছে। আগের জন্ম নাকি জানা যায়!

সন্দেহ নিরসন করেছে সুতং লামা আবার সুলভার মনের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে। —আগের লামাকে পরের জন্মে চেনা যায়?

সুলভা শুনেছে একথা। কিন্তু সত্যিই কি হয়?

সুতং লামা বলল, নিজে ধ্যান করে জানই না আগে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাবি। জাতিস্মরের মতো অতীত জন্মের ছবি ভেসে উঠবে চোখের সামনে ঠিক বাস্তবেরই রূপ নিয়ে, ভেসে উঠবে বর্তমান, ভেসে উঠবে ভবিষ্যৎ।

সুতং লামার নির্দেশ মেনেছে সুলভা।

দেখেছে নিজেকে স্পষ্ট। সে গতজন্মের অমৃতা। মনোয়ারের মা।

অমৃতা একমাত্র ছেলে—মনোয়ারকে ফেরানোর জন্য জীবনপাত করে গেছে, ফেরেনি। অমৃতা মরেছে—আকাঙ্ক্ষা মরেনি। সেই কাজের ভার নিয়ে আবার এসেছে অমৃতা। এবারে সুলভা সে। আর মনোয়ার? শীতানু।

শীতানু দেখছে, সুলভা দাঁড়িয়েছে। এ সুলভার প্রেতাত্মা নয়। সুলভা স্বয়ং। মুখে স্বর্গীয় হাসি। দেহে দিব্যজ্যোতি। বর-অভয়দাত্রী দেবীমূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে যেন।

নতুন জীবনে আশীর্বাদ নিতে হবে দেবীর কাছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে শীতানু।

দুই

উদয়পুরের হ্রদে কি একটা না একটা বিভীষিকার রাজ্য নামবেই? হ্রদের মাঝখানে জঙ্গল-ভরা দ্বীপটায় নীল গাই শিকারে মানুষের কি উন্মত্ত নেশা। হ্রদের তীরে ফটিক জলে নিজেকে নিজে দেখছিলুম আমি তন্ময় হয়ে। এবারেও আর এক শিকার-পাগল যুবকের এলোমেলো গুলিচালনা। দর্শনার্থী যাত্রীদের হৃৎকম্প—পড়িমরি করে দৌড়ল সকলে। ঠেলাঠেলিতে টাল সামলাতে না পেরে ভীড়ের চাপে পড়ে গিয়ে পায়ে আঘাত পেলুম দারুণ।

আসতে হল আমার বেতিয়া হাসপাতালে।

যে ঘরে যে বেডে আমায় রাখা হল পায়ের হাড় জোড়বার জন্য, এক সময় নাকি স্বপ্নাও ছিল।

কে স্বপ্না? ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছি।

স্বপ্নার কথা বলতে গিয়ে অনিবার্য ভাবেই ও'র মুখে এসে পড়েছে অধীপের কথা। বলতে বলতে ও'র দুই চোখ সজল হয়ে উঠছে বারবার

জলের তলায় ভেঙে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল স্বপ্না। বন্দুকের আওয়াজটা সজোরে আঘাত হেনেছে বুকে। কেঁপে উঠেছে স্বপ্না। আর সেই সঙ্গে কাঁপন ধরেছে উদয়পুরের হ্রদে—কাক-চোখ জলে।

আবার বন্দুকের আওয়াজ, আবার।

বরফ-জমা হিমালয়ের কোল থেকে লাল গলার হাঁসেরা ভয়েময়ে উড়ে গেল। কোথায় কে জানে! শীতের বিকেল নামেনি এখনো, এর মধ্যে যত বিপত্তি।

নীল গাইয়ের পিঠ দিয়ে রক্ত ঝরছে। প্রাণ বাঁচাতে প্রাণপণে ছুটে পালালো ওপারের জঙ্গলে।

নৌকোটা মধ্যিখানের দ্বীপ অবধি এগিয়েছে সবে। নৌকোর মানুষের গান থেমে গেল হঠাৎ, মাঝপথে। নৌকো ফিরে আসছে, তীরে ভিড়বে!

স্বপ্না গান শুনছিল তন্ময় হয়ে।

এ গান যেন তার জানা, বহুবার শোনা। এ গলা সুর কথা—সবই যে চেনা-চেনা। কোথায় শুনেছে, কার কাছে শুনেছে, কে গেয়েছে—বার বার মনে করতে চেষ্টা করেছে। ভাবনার অতল তলে তলিয়ে গেছে, কূল-কিনারা পায়নি কোন। বরং নিজের ভেতর নিজেই হারিয়ে গেছল।

ওদিকের যুবক শিকারের আনন্দে মেতে উঠেছে। নীল গাইয়ের রক্ত দেখে শিরা-উপশিরায় রক্তের উন্মত্ত-নৃত্য চলেছে। যুবকের মাটিতে পা পড়ছে

না। লাফিয়ে লাফিয়ে শূন্যে পা ফেলে ছুটছে। অট্টহাসিতে গোটা হ্রদটা তোলপাড় করে তুলেছে। বন্দুক ছুঁড়ছে ঘন ঘন।

উদয়পুরের হ্রদে ত্রাসের রাজ্য নামল।

যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল প্রাণ ভয়ে।

যেরকম এলোমেলো গুলি ছিটকোচ্ছে, কার বুক ছেঁদা করে দেবে কে বলতে পারে! সকলের বারণ কানে যাচ্ছে না যুবকের। কার ওপর দৃষ্টি, কার ওপর না-দৃষ্টি—বোঝাই যাচ্ছে না।

প্রকৃতির শান্ত-সুন্দর দৃশ্য ক্যামেরার চোখে ধরে রাখতে কতই না চেষ্টা বিজনের। সেই থেকে এসে অবাধ ছবির পর ছবি তুলছে। বাধা পড়ল। স্বপ্নার কাছে এসে হাত ধরে তুলতে যাচ্ছে, ক্ষীণ কণ্ঠে বারণ করল স্বপ্না— আমি যাব না। আমার ভয় হচ্ছে, নৌকোর ওই গাইয়ে ভদ্রলোকের না কিছু হয় এই গুলি-বৃষ্টিতে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের শব্দ। নৌকোর মাঝি চিৎকার করে উঠল— রুখ যাও।

স্বপ্নার মনে হল, গাইয়ে ভদ্রলোকের কিছু হয়েছে বুঝি। বুকের যন্ত্রণাটা বেড়ে উঠল। চেপে ধরল বাঁ হাতে। অন্ধকার দেখল চোখে!

মহাবিপদে পড়ল বিজন বেহুঁশ স্ত্রীকে নিয়ে।

নৌকো এসে ভিড়ল এপারে।

বিপদের কাণ্ডারী হয়ে দেখা দিল অধীপ বিজনের সামনে। স্বপ্নার বেহুঁশ হওয়ার কারণ জানিয়েছে বিজন। নিজের গাড়ি করে বেতিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেছে অধীপ স্বপ্নাকে।

বেতিয়া রাজাদের তৈরি হাসপাতাল। রাজাদের আত্মীয় অধীপ। রাজ্যপাট চলে গেলেও, প্রতিষ্ঠাতাদের জ্ঞাতির পূর্ণমাত্রায় মর্যাদা দিয়েছে হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স—প্রত্যেকটি লোক।

আলাদা কেবিনে রেখে, সেবাশুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছে ডাক্তার-নার্সরা। দিনকতক হাসপাতালে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে রাখতেও বলেছে। কমজোরি হার্ট—বাইরে নিয়ে বেরোনো ঠিক হয়নি।

কলকাতার ডাক্তাররা মাস ছয়েক ধরে সুস্থ বলে ঘোষণা করেছে। ওদের পরামর্শ নিয়েই বেরিয়েছে বিজন। বেশ ভালো ছিল। আচমকা রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

একটু ঘাবড়ে গেছে বিজন ডাক্তারদের বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলতে। বিদেশ-বিভুঁয়ে নিজেকে বড় অসহায় বোধ করছে।

মুখ দেখে বুঝেছে অধীপ। বলল—ওঁকে সারিয়ে নিয়ে যাবেন। আপনার কোন চিন্তা নেই।

চিন্তা নেই! বিয়ের পর থেকেই স্বপ্নাকে নিয়ে চিন্তার শেষ নেই বিজনের।

একটু যদি তার মন পেত, কোন কথাই ছিল না! এত নরম মনও মানুষের থাকতে পারে—এটা বিজনের নতুন অভিজ্ঞতা। সদাই উদাস-উদাস, কি যে ভাবে নিজেও জানে না।

বিজন জিজ্ঞেস করতে কিছু বাকি রেখেছে নাকি? এক-আধবার নয়—অনেক, অনেকবার। জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পেয়েছে, তুমি কি কষ্ট পাও আমার জন্য? আমার কি হয়—কিছু বুঝতে পারি না। কেবলি মনে হয়, আমি একা। বেড়াতে ভালো লাগে না, আনন্দ করতে ভালো লাগে না। লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে তো হাঁপিয়ে উঠি। দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথা ঝিমঝিম করে! আমি কি চাই—নিজেও জানি না।

স্বপ্না নিজে না জানুক বিজন জানে। একটা জিনিস ভালোবাসে—সেটা গান। গান শুনলে কেমন আনমনা হয়ে পড়ে। গানের সুর শুনলেই কোথায় যেন চলে যায় ও। পাশে কেউ এসে দাঁড়িয়ে থাকলেও টের পায় না!

কতবার এসে দাঁড়িয়ে থেকেছে বিজন। ধ্যান ভাঙেনি। জোরে নিশ্বাস ফেলতে, কি চমকান না চমকেছে। নিজেকে বিব্রত বোধ করেছে। আর স্বপ্না হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে, বুকটা বড্ড ধড়ফড় করছে। প্রাণটা বেরিয়ে যাবে বুঝি।

ধীরে ধীরে বুক ধড়ফড়ানি রোগে দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্নার। ডাক্তার যখন দেখল বিমর্ষ মুখে কপাল কুঁচকে বলল, এই বয়েসে বুকের রোগ!

সেই কুড়ি বছর বয়েস থেকে চলল বিশ্রাম বিশ্রাম আর বিশ্রাম। বছর চারেক ধরে বিজনের উৎকণ্ঠায় কেটেছে দিনরাত।

ভেবেছিল, রোগমুক্ত হয়েছে স্বপ্না। আবার আক্রমণ। মুষড়ে পড়ল। ডাক্তার বলল, কোনরকম উত্তেজনা যেন না আসে রুগীর। দুঃখ শোকের কথা তো শোনাবেই না। হাসি আনন্দেও উচ্ছ্বাস উত্তেজনা যেন না এসে পড়ে। রুগীর সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে অতি সাবধানে।

বিজন তাকিয়ে আছে স্বপ্নার মুখের দিকে, লোহার খাটের পাশের চেয়ারে বসে। মাথার কাছাকাছি। মাঝখানের চেয়ারটায় অধীপ। ডাক্তার নার্স'রা স্বপ্নার দু'পাশে।

জ্ঞান ফিরে তাকাতেই কতদিনের চেনা লোককে দেখল যেন স্বপ্না অধীপের মধ্যে। দেখছে! তার কাছে আর কেউ আছে, না আছে কোন খেয়াল নেই। অধীপও কেমন হয়ে গেছে। ওই চোখ থেকে তারও দু'চোখ ফেরাতে পারছে না। ফেরাতে পারছে না ঠিক নয়, ফেরাতে চাইছে না। কার চোখের মতো যেন। মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে।

এখন কিরকম বোধ করছেন? ডাক্তারের কথায় দুজনেই নিজের জগতে ফিরে এলো। জানলা দিয়ে পশ্চিম আকাশের লাল আলো এসে সিঁথির সিঁদুর আর কপালের লাল টকটকে টিপটাকে আরও লাল করে তুলছে। স্বপ্নার মুখেও লাল আভা, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

আবার মুগ্ধ চোখে দেখছে অধীপ! এ মুখ—কার যেন? সট্ করে স্বপ্নার মুখ থেকে লাল আলোটা সরে গেল। জানলার পরদা টেনে দিল নার্স। পড়ন্ত রোদ লাগা ভালো নয়। আকাশের নীলে ডুবেছে সূর্য লাল আবির ছড়িয়ে দিয়ে।

আবির রঙের শাড়ির আঁচলটা স্বপ্না মাথার ওপর টেনে দিল।

বাড়িতে এসে অনবরত অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে অধীপ। শিরাউপশিরার রক্তের মধ্যে দিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে এক অজানা যাতনা। ছেলের মরণাপন্ন অসুখ হয়েছে, বৌয়েরও হয়েছে, এমন হয়নি।

রাত পোহাবে কখন, হাসপাতালে স্বপ্নার সঙ্গে দেখা হবে কখন? বিছানায় একবার শুচ্ছে—একবার উঠে বসছে। এতটুকু স্থির করতে পারছে না।

স্বামীর ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাজ্জব নীতা। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, ঘুমোচ্ছো না কেন?

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল অধীপ। এ মুখেও ওই মুখ দেখছে। স্বপ্নার।

—অমন করে কি দেখছো?

—কিছু না, এমনি; তুমি ঘুমোও। অরূপ উঠে পড়বে আবার।

সবুজ রঙের ঘরে দু'দিকে দুখানা খাট। এদিকে অধীপ ওদিকে নীতা। চার বছরের অরূপকে নিয়ে শোয়। নীতার মনে খটকা লাগছে। যে মানুষকে দেখে আসছে আজ পাঁচ বছর ধরে, এই মুহূর্তে কিন্তু সে মানুষকে খুঁজে পেল না।

গানপাগল অধীপ সবদিন যে রাতে ঘুমোয়, তা নয়। ছাদের ঘরে একা তানপুরার তারে আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে সুর ধরে। নিশুতি রাতের পাগল-করা সুর নীতাকে পাগল করে তোলে দোতলার ঘরেও। কত দূর থেকে যেন ভেসে আসে কানে স্বামীর মিষ্টি ভরাটি-গলা। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে গান শুনছে মনে হয়। তারপর আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙে একটা মধুর আমেজে, প্রাণভরা আনন্দের মধ্যে। আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এ গান এ সুর জেগে থাকতে দেয় না তাকে। আজ অন্য। গান নয়, সুর নয়—এতদিনের অভ্যেস—আচমকা পরিবর্তন। একটা অজানা অস্বস্তি নীতার ভেতরে জেঁকে বসেছে। কখনো স্বামীকে দু বার জিজ্ঞেস করেনি কোন কথা, আপনভোলা ভাবুক স্বামী। মুখের খাওয়া পড়ে রইল, গুনগুন করে গাইছে। নীতা এসে খাবারের থালা মুখের কাছে ধরে খাইয়ে দিয়েছে। সরল শিশুর মতো হাসতে হাসতে খেয়েছে। বলেছে, সত্যিই খিদে পেয়েছিল দেখছি খুব। তুমি বুঝলে কি করে?

কৌতুকের হাসি হেসে বলেছে নীতা, আমি যে জ্যোতিষ জানি। এমন একটা গণনা জানি—সকলের মনের কথা বুঝতে পারি।

হো হো করে জোরে হেসে উঠেছে অধীপ। বারান্দায় খেলা করছিল অরূপ মোটর চালাচ্ছিল। বাপের হাসি শুনে দৌড়ে এসেছে ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে নীতা উঠে পড়েছে জলখাবারের থালা নিয়ে। ছদ্মকোপে বলেছে ছেলেকে, খালি খেলা আর খেলা—খাওয়ার নাম নেই। দুষ্টু কোথাকার! খিদে পায়নি?

পেয়েছে। দুষ্টুমি করে নাকি নাকি সুরে বলেছে অরূপ। ক্ষীরের পেঁড়াটা আধখানা ভেঙে অরূপের মুখে গুঁজে দিয়ে বলেছে, খাও। আর নয়। খানিক আগে দুধ খেয়েছো পেট ভরে।

নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেছে অরূপ।

বাকি আধখানা গুঁজে দিয়েছে নীতা অধীপের মুখে। মৃদু হেসে চলে গেছে ঘর থেকে। বাইরে গিয়ে জানলার খড়খড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছে অধীপের সুর ভাঁজা। অনেক ভাগ্য করে এমন স্বামী পাওয়া যায়। ছোটবেলায় শিবপুজো করা সার্থক হয়েছে।

নীতা কোনদিন কোন চিন্তার ছাপ দেখেনি মানুষটার মুখে। সদা হাসি-খুশি দিলখোলা মানুষ। আজ শুধু চিন্তা নয়, গভীর চিন্তার ছাপ মুখে।

—তুমি শুতে গেলে না? অরূপ উঠে পড়বে, যাও!

উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু উঠল নীতা। স্বামীর কথার অবাধ্য হওয়া স্বভাব নয় তার। কার্পেট মাড়িয়ে মাড়িয়ে অরূপের খাটের দিকে আসছে। একটা চিন্তার কাছে নীতা কোন যুক্তি খাড়া করতে পারছে না। মানুষটার মুখে হাসি নেই। সে হাসি সদাসর্বদা মাখানো থাকত ঠোঁটে। গলা অস্বাভাবিক গম্ভীর। অত মিষ্টি গলা কোথায় হারিয়ে গেল? মনে হল, কথায় বিরক্তি মেশানো। কাছে বসে থাকাটা ভালো লাগছিল না।

ছোট্ট গোল শ্বেতপাথর বসানো টেবিলটায় ধাক্কা খেল নীতা। ফুলদানিটা উল্টে পড়ল কার্পেটের ওপর। হাঁটুতে লেগেছে খুব, নীতা বসে পড়ল হাঁটু ধরে।

খাট থেকে নেমে এলো তাড়াতাড়ি অধীপ। উঠে পড়ল অরূপও। সবুজ ডিমলাইটটা জ্বলছে। ফুলদানি থেকে ছিটকে পড়েছে চন্দ্রমল্লিকার তোড়া। অধীপ-অরূপ দুজনেরই প্রিয় ফুল। সকালে বাপছেলে ফুলবাগান থেকে নিজে হাতে তুলেছে। তোড়া গড়েছে নীতা।

মায়ের লাগুক দুঃখ নেই, ফুলের লেগেছে বড্ড। অরূপ কেঁদে উঠল। অধীপ স্ত্রীকে তোলার আগেই ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে দিল ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য। এগিয়ে ধরল ফুলদানিটা, ছেলের চোখে দেখল ওই চোখ। স্বপ্নার।

ফুলদানিটা পড়ে গেল হাত থেকে।

কেঁদে উঠল অরূপ।

এতে নীতার কান্নার কিছু নেই। তবু নীতার কান্না এলো।

সকাল হতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে অধীপ।

রোজের রেওয়াজ বন্ধ। তানপুরা যে ছোঁয়নি একদম, তা নয়। তানপুরার তারে হাত ঠেকাতেই ভেতরটা হু-হু করে উঠেছে। বসতে পারেনি। হাসপাতালের দিকে মন টেনেছে খালি।

গতকাল বিজনের কাছে জেনেছে, কোথায় এসে উঠেছে ওরা। বিজনের

বাড়ির দিকে গেল। ওকে না নিয়েই বা যাওয়া যায় কেমন করে।

বিজনের বাড়ির সামনে পায়চারি করছে। পূব-আকাশে গোলাপী ছোপ। রামধনু রঙের পাখিটা নীল ঠোঁট দিয়ে গাঁদাফুল ঠোকরাচ্ছে আর মিষ্টি গলায় ডাকছে থেকে থেকে। পাখিটার মাথার রঙ সিঁদুরের মতো। একটা টিপ পরিয়ে দিয়েছে কেউ যেন আদর করে।

নীল শাড়ি সিঁথির সিঁদুর কপালের সিঁদুর টিপ জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠছে অধীপের চোখের সামনে। পায়চারি করতে করতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে ও। আবির রঙের শাড়ি পরে এসে দাঁড়িয়ে আছে স্বপ্না। স্বপ্না কে? কে, কে? অধীপ শুনতে পাচ্ছে নাচের আওয়াজ। কত্থকের বোল উঠছে তার দু'পায়ে। মুখের বোল পা বলছে। এই ঢঙের নাচের বোল কার ঘুঙুর পায়ে দিয়ে চলার সময় যেন বেজে উঠতে শুনেছে। অস্থির পায়ে এলোমেলো পা ফেলে চলছে অধীপ। মনে করতে চেষ্টা করছে। আসি আসি করেও আসছে না কিছুতেই। ভেতরে একটা হাঁকুপাঁকু ভাব প্রবল হয়ে উঠছে। ডান হাতের তেলোয় বাঁ হাতের ঘুষি বসাচ্ছে জোরে জোরে।

একা-একা এই অবস্থা দেখলে, অধীপকে পাগল না বলে কিছুতেই থাকতে পারবে না লোকে। ভাগ্যিস রাস্তাটা নির্জন। নির্জন হলেও একজন কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে। বিজন ওপরের জানলায় দাঁড়িয়ে। মনে মনে কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই তার। কত বড় ঘরের ছেলে, কি অমায়িক এই অধীপ। পরদেশী হয়েও আপনজনের বাড়া। এখানে এসেছে নিশ্চয় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কি দায়িত্ব কি কর্তব্যবোধ। যেটা অধীপের করার কোন প্রয়োজন ছিল না। অযাচিত উপকার। এমনতর লোকদেরই হয়তো দেবতা বলা হয়।

দেখে মনে হচ্ছে, স্বপ্নার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা অধীপের। বিজনের এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। কেমিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। বড় কোম্পানিতে উঁচু আসনে বসে আছে। শান্তির জীবন সম্মানের জীবন। যথেষ্ট সম্মান পায় অফিসে বাড়িতে—সর্বত্র। কিন্তু মন মরুভূমি তবুও। স্বপ্নার বারো মাস অসুখ আর অসুখ। একটু ভালো থাকলে তখনও কেমন-কেমন। বিজনের কাছে থেকেও কাছে নেই।

নাচের জোর আওয়াজে ওপর দিকে তাকাল অধীপ।

চোখাচোখি হল দুজনের। বিজন আর অধীপের। অপ্রস্তুতে পড়ল অধীপ। হেসে বলে উঠল বিজন, মেয়ে নাচছে। দয়া করে ভেতরে আসুন না।

নিচে নেমে এলো বিজন।

অধীপকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। ওপরে উঠল দুজনে। সিঁড়ির সামনাসামনি ঘরে আপন মনে নাচছে পূর্বা। চেহারা অবিকল স্বপ্নার। ছোট স্বপ্না।

বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে দেখছে অধীপ।

পরিচয় করানোর জন্য মেয়েকে ডাকতে যাচ্ছিল বিজন, ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে, ইশারায় বারণ করল অধীপ। কিছুক্ষণ কাটল।

নজর পড়তেই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল পূর্বা বিজনকে—মায়ের কাছে নিয়ে যাবে তো বাপি?

—আজ জিজ্ঞেস করে আসি। তোমার মা যদি বলে—বিকেলে নিয়ে যাবো'খন। পাঁচ বছরের মেয়ের পনেরোর মতো বুদ্ধি। চঞ্চল হয়ে উঠল না, কোন পেড়াপীড়ি করল না। হেসে ঘাড় নেড়ে একটা ছোট্ট কথা বলল, আচ্ছা।

নন্দরানীর কাছে মেয়েকে থাকতে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল বিজন। সঙ্গে অধীপ, হাসপাতালে যাচ্ছে। রাস্তায় বলল অধীপকে, ভাবছেন মেয়েটাকে রেখে এলুম কেন? স্বপ্নার জন্য। স্বপ্না বকাবকি করবে নাচ প্র্যাকটিস না হলে। ও অসুখ-বিসুখ করলে মেয়েকে কাছে যেতে দিতে পছন্দ করে না। বলে, আমার নিজের চেয়ে আমি নাচগান ভালোবাসি বেশি করে। আমার অসুখের অজুহাত দেখিয়ে নাচ বন্ধ করলে একদম চলবে না। আমাকে বলে, ঈশ্বর হার্টের রোগ দিয়ে আমার নাচ বন্ধ করল, আমার গান বন্ধ করল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো নিজের মেয়ের সামনেই কাঁদে। আর বলতে গেলে কি ওই তো মেয়েকে নাচ শিখিয়েছে প্রথম। কি নামই করেছিল স্বপ্না নাচে। বিয়ের পর থেকে সব কেমন যেন হয়ে গেল। ওর সব সুখে জলাঞ্জলি, আর আমারও তাই। বলে, মেয়েটা মানুষ হোক—দেখে যেন যেতে পারি।

বিজন চুপ করে গেল। কি যেন কি ভাবল একটু। তারপর বলল, আমার মতো মেয়েরও দশা। কতটুকুই বা স্বপ্নার সঙ্গ পায় বেচারা। আমায় মানুষ করেছে যে, সেই থুত্থুড়ি নন্দরানীকেই মানুষ করতে হচ্ছে আবার আমার মেয়েকেও! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বিজন।

স্বপ্না নাচ জানে, নাচত; গান জানে, গাইত। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে অধীপের দুটো কথা—নাচ আর গান। স্বপ্নার জন্য সহানুভূতি আসছে, বুকে মোচড় দিচ্ছে। একদিন দেখা—একদিনের ব্যাপারে স্বপ্নাকে মনে হচ্ছে কতদিনের জানাশোনা কত কাছের। এরকম তো অন্য কাউকে দেখে মনে হয়নি আজ অবধি। এমনকি নীতাকেও না।

স্বপ্নার নাচ কি দেখেছে কখনো অধীপ? শুনেছে কি ওর গান কখনো? মনে করতে পারছে না। তবুও মনে হচ্ছে, দেখা-শোনা। এমনি দূর থেকে নয়, একেবারে সামনে বসে!

স্মৃতির সিন্দুকে চিন্তার হাতুড়ি দমাদম আওয়াজ তুলে ঘা মেরে মেরেও চাবি ভেঙে ডালা খুলতে পারছে না কিছুতেই। এ এক দুঃসহ যন্ত্রণা।

—ওদিকে কোথা যাচ্ছেন অধীপবাবু? হাসপাতালে এসে গেছি যে।

আনমনা ভাবটা কেটে গেল অধীপের বিজনের ডাকে। সজাগ হয়ে উঠল।

আগের দিনের জায়গায় কাঠের গদি-আঁটা চেয়ারে বসে আছে অধীপ। কেবিনে প্রবেশের মুখেই আহ্বান অভিনন্দন পেয়েছে স্বপ্নার কাছে। —আসুন আসুন, আসুন! আপনার জন্যে ভাবছিলুম। কেমন হয়েছে? গান গাওয়ার ফল হাতে হাতে পেয়েছেন তো? সারা রাত চোখে-পাতায় এক করতে পারেননি নিশ্চয়?

ম্লান হেসে অধীপ বলেছে, একটুও মিথ্যে নয়, ধরেছেন ঠিকই! নার্স-ডাক্তার অবাক। আগে পরিচয় ছিল হয়তো। বিজনের মনেও খটকা লাগল। কলেজ-জীবনের পুরনো বন্ধুবান্ধব হবে বা। নইলে এত সহজ হয় কেমন করে দুজনে। স্বপ্নার এমন আনন্দে আত্মহারা ভাব—কাউকে দেখে—এর আগে কোন সময়ের জন্য নজরে পড়েনি তো!

গম্ভীর মুখে মাথার কাছে চেয়ারে এসে বসেছে চুপচাপ। কেমন আছো—জিজ্ঞেস করতেও ভুলেছে।

স্বপ্না অধীপের দিকে চেয়ে বলল, মুখ শুকনো দেখছি, সকালে একটু চাও পেটে পড়েনি। এখানে খান একটু।

না, না। এখানে ওসব দরকার নেই। আপনি সুস্থ হয়ে উঠলে আপনার বাড়িতে হবেখ'ন। বাড়ি দেখে এসেছি তো।

বিজনের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসল স্বপ্না। ওখানে নিশ্চয় এক কাপ চাও জোটেনি। ওঁকে তো জানি আমি। নানা জিনিসের টেস্ট করা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত উনি। সে অফিসের ল্যাবরেটরিতে যেমন, বাড়িতেও তেমন। ওই চিন্তায় বিভোর দিবারাত্তির। ওর টেস্টটিউবে মানুষের মনের ব্যাপার ধরা পড়ে না কেবল—এই যা দুঃখু।

কেবিনের বাতাসটা হালকা হয়ে উঠল। গম্ভীর মুখ মোলায়েম হল। ফিক করে হেসে ফেলল বিজন।

হাসল অধীপ, হাসল স্বপ্না।

টোস্ট মেঠাই আর চা নিয়ে এলো বয়।

মাথার দিকটা উঁচু করে দেয়া হয়েছে খাটের। আধশোয়া অবস্থায় চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে স্বপ্না এগিয়ে দিল অধীপের দিকে।

ধরুন, ধরুন। দেরি করবেন না, পড়ে যাবে হাত থেকে এখুনি।

কাপটা হাতে নিতে বাধ্য হল অধীপ।

স্বপ্নার মুখেচোখে পরিতৃপ্তি উপচে পড়ছে। মেঠাই-টোস্টের প্লেটও ওই ভাবে তুলে দিল স্বপ্না অধীপের হাতে।

বহুকালের পুরনো আদর পুরনো ভালোবাসা নতুন করে যেন ফিরে পাচ্ছে অধীপ। এ আদর এ ভালোবাসার সঙ্গে তুলনা হয় না কারো আদর-আপ্যায়নের। নিজের অজান্তে এইটাই চাইত বুঝি অধীপ। পেত না বলে পায়নি বলেই ভেতর খাঁ-খাঁ করে উঠত সময়-সময়। মনে হত, কি যেন চায় সে, খুঁজে পাচ্ছে না। তার চাওয়া পাবে না জীবনে। পেয়েছে। সর্বাঙ্গে অপরিসীম

আনন্দের অনুভূতি। নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে।

চলে আসার সময় চমকে উঠল অধীপ স্বপ্নার কথা শুনে, আপনার গানটার শেষ শুনতে পেলুম না।

এ কথাটা বহুবার শোনা যে তার। অধীপ চেয়ে আছে মৌনমুখে। আবার মাথার মধ্যে তালগোল পাকাচ্ছে।

স্বপ্না বলল, গান শোনানোর জন্যে অত কৃপণ হবেন কেন? এত আকাশ-পাতাল চিন্তার কি আছে! আমি ছাড়ছি না কিন্তু, শোনাতেই হবে।

—আচ্ছা, আপনি বাড়ি ফিরুন না।

—বাড়ি ফেরা তো ডাক্তারবাবুদের মর্জির ওপর নির্ভর করছে। আমার কোন হাত আছে কি? এখানেই একদিন আস্তে আস্তে শুধু গলায় শোনান না! হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটা যদি বন্দুকের খেলা না দেখাতো, শোনা হয়ে যেত তাহলে তো আমার। কি কথা, কি সুর। আমি ঘুমিয়েও শুনি। শেষটা শোনার জন্য ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ি থেকে থেকে। এই গানটা কোথায় যেন শুনেছিলুম।

কপালে ঘাম জমেছে। দু'চোখ বুজে এলো স্বপ্নার। মুখখানা বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কেবিন থেকে বেরিয়ে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এলো অধীপ। ততক্ষণে নার্স স্বপ্নাকে দশ ফোঁটা কাঁজিনেন খাইয়ে দিয়েছে। চোখ খুলছে স্বপ্না। হাসছে। খুব আস্তে আস্তে বলল, ঠাকুমা বলত, মেয়েছেলের প্রাণ—কইমাছের জান। ভয় পেয়ে গেছলেন? সহজে মরণ নেই আমার।

—আপনি চুপ করুন! গান একদিন শোনাবো। ডাক্তারবাবুরা কথা বলতে বারণ করছেন। বড় বেশি কথা বলছেন।

নার্স রুগীর বিশ্রামের জন্যে ঘর ফাঁকা করে দিতে অনুরোধ করল সকলকে।

এতক্ষণ কাঠের পুতুলের মতো চুপচাপ বসেছিল বিজন। সে এখানে অবাঞ্ছিত, অনাহূত যেন। এখন নড়ল। উঠল। বলল, আসি।

—এসো! আসার সময় অধীপবাবুকে সঙ্গে আনতে ভুলবে না।

সমস্ত কিছুই তো ভুলে বসেছিল বিজন। মেয়ের আসার সময়কার কথা মনে পড়ল। বলল, পূর্বাকে নিয়ে আসব কি?

হাত নেড়ে জানাল স্বপ্না—না।

পথ চলতে চলতে নিজের কৌতূহল চাপতে পারল না বিজন। অধীপকে জিজ্ঞেস করে বসল, কলকাতায় আপনার যাতায়াত বোধ হয় বহুদিনের?

—না, এখনো যাইনি, একবারও।

দিন পনেরো ধরে প্রতিদিনই অধীপ সকাল-সন্ধ্যা আসছে। দু'বেলাতেই একটা কিছু না খাইয়ে স্বপ্না ছাড়বে না! অন্তত রুগীর ফল, নয় একটা আপেল, নয় একটা লেবুও খেতে হবে। ছাড়ান-ছিড়েন নেই কোন রকমে।

মুখে 'না-না' বললেও অন্তরের ইচ্ছে আলাদা। স্বপ্নার মুখ থেকে 'খান-

খান' কথাটার অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে। ওর হাত থেকে নিয়ে খেতে ভালো লাগে।

অমৃত বলে পৃথিবীতে কিছু আছে কিনা জানে না। সত্যিসত্যিই যদি কিছু থেকে থাকে কখনো বা, বর্তমানেও আছে, অন্য কোথাও নয়—আছে স্বপ্নার ভেতর, স্বপ্নার হাতের যে কোন বস্তুর ভেতর। ওর হাতের জিনিস খেলে, ভরে যায় মন, ভরে যায় প্রাণ। মনে হয় অধীপ বুঝি অমর হয়ে গেছে। মৃত্যু নেই তার। কেউ কখনো মেরে ফেলতে পারবে না তাকে।

মনের কথা বলে ফেলেছিল একদিন স্বপ্নাকে। স্বপ্না যেন তার চোখে কি দেখল। শিউরে উঠল।

অধীপ জিজ্ঞেস করেছে, ভালো কথা শুনে ভয় পেলেন নাকি?

—না, একটা বিচ্ছিরি স্বপ্নের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মানুষ স্বপ্ন ভোলে, আমি কিন্তু ভুলতে পারিনি এতদিনেও।

—আট কি নয় হবে তখন। একদিন রাতে স্বপ্নে দেখছি—পেছন থেকে একজনের ঘাড়ে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিল একজন। কি রক্ত! আমি মূর্ছা গেলুম।

মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে এলো স্বপ্নার। সারা শরীর কাঁপছে। ডাক্তার নার্সকে ডাকতে হল।

অপরাধী মুখ করে বসে থেকেছে অধীপ। না জিজ্ঞেস করলেই ভালো ছিল। কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি অধীপের। গলাটায় কি যন্ত্রণা! কথা বেরোনো দূরের কথা, ঢোঁক গিলতে পর্যন্ত পারেনি।

এর পর ভেবেছে আর আসবে না। কিন্তু থাকতে পারেনি। আসার সময়টা পার করে দিতে চেষ্টা করেছে, খানিকটা অতি কষ্টে পার করে দিতে পারলেও শেষ পর্যন্ত আসতে হয়েছেই।

এসে শুনেছে, এলে তবু ভালো থাকে স্বপ্না, না এলে এমন উদ্বেগ এমন কাহিল হয়ে পড়ে যে, বুকের নাচুনি বেড়ে যায়, যম-যাতনা। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অক্সিজেন না দিয়ে উপায় থাকে না।

নার্সদের মতো বিজনও বলেছে, আপনিই দেখছি রোগ সারানোর প্রধান ওষুধ। আপনি আসা বন্ধ করলে—রুগীর কিছু হলে—সে দায়িত্ব আপনার। অধীপ আসে তাই রোজ হাসপাতালের কেবিনে।

প্রায় পঁচিশ দিন হতে চলেছে। স্বপ্না এখন বেশ সুস্থ। আসল তত্ত্বকথা একদিনও ভোলেনি। দু'বেলায়ই যাওয়ার সময় বলেছে, গানটা শোনান না। অধীপ একই উত্তর দিয়েছে, নিশ্চয় শোনাবো।

শোনানোর জন্য প্রস্তুতির প্রয়াস কম হয়নি। এটা স্রেফ মনের প্রস্তুতি। মন ঠিক হলেও গলা বেইমানি করেছে। স্বর বেরোয়নি। গলার ভেতর একটা যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। দারুণ ব্যথা অনুভব করেছে। যবে থেকে স্বপ্না

হাসপাতালে, তবে থেকে এই পর্ব চলেছে। আর তা ছাড়া এমনিতেই গান গাইতে ইচ্ছে করে না!

হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেবে এবার।

বিজন বলেছে, আর নয়। দু' একদিন বাড়িতে রেখেই সটান কলকাতা-মুখো। ভেবেছিলুম, স্বপ্নার মনটা ভালো হবে বাইরের দৃশ্য দেখলে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। উল্টো ফল। ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওর মা-বাবার হাতে তুলে দিতে পারলে বাঁচি। ফোটো তোলার সাধ-আহ্লাদ যা মিটল, খুব! ছুটিও ফুরিয়ে আসছে।

এসব শোনার পর থেকে আপনজন দূরে সরে যাওয়া ব্যথা অনুভব করতে শুরু করেছে অধীপ। মনকে বোঝাচ্ছে খালি—স্বপ্নাকে ফিরে যেতে হবেই তো। উপায় নেই। পুরো গানটা শুনিয়ে দেয়া উচিত তার।

ছুটির দু'তিন দিন আগে চেষ্টা করল গাইতে। ঠাণ্ডায় ঘেমে নেয়ে উঠল। গান তো গাইতে পারলই না, বসে থাকতেও না।

স্বপ্নার সামনে বসে গান গাইতে গিয়ে গানের ভাষা ভুলে গেছে। তার জায়গায় দুটি নাম মনের কানে বেজে উঠেছে কেবল। একটি ছেলের নাম, একটি মেয়ের, দ্বিজদাস আর লাবণ্য।

বাড়িতে ফিরতে ছাদের ঘরে কে যেন টেনে নিয়ে গেল তাকে। আপনা হতেই এগিয়ে গেল তানপুরার দিকে। কার্পেটের ওপর শোয়ানো ছিল তানপুরা। তুলে নিল। তানপুরার কান মলে মলে সুর বাঁধল। গলার কোন জ্বালা যন্ত্রণা নেই। পরিষ্কার সুর বেরিয়ে আসছে। খুব আশ্চর্য লাগল।

যে গানটা শুনতে চেয়েছে স্বপ্না সেই গানটাই বুক ঠেলে গলা ঠেলে জোর করে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অধীপ একা ঘরে গান ধরেছে। মনে মনে গান শোনাচ্ছে স্বপ্নাকে। দু'চোখ বুজে স্বপ্নাকে দেখছে। স্বপ্না বসে শুনছে একমনে।

স্বপ্নাকে দেখতে পাচ্ছে না আর। লাবণ্য মনে হচ্ছে না? হ্যাঁ, লাবণ্যই তো। হাসতে হাসতে বলছে লাবণ্য, দ্বিজুদা! গানটা তাড়াতাড়ি শেখালে না তুমি। আচ্ছাই যা হোক। এখন আমি কি করি?

আর তো মোটে দিনকতক বাকি। এর মধ্যে শেষটা শিখিয়ে দাও না।

চোখ চাইল অধীপ। কেউ কোথাও নেই! জানলার ধারে এসে বসল। আকাশের ঘন নীলে দু'চোখ আটকেছে। দু'একটা টুকরো সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়াচ্ছে অধীপের মন।

কোন অজানা দেশে চলেছে অধীপ।

অধীপ লাবণ্যর কথা শুনছে আবার।

—দ্বিজুদা, শিখিয়ে দাও না! শিখিয়ে দাও না! শিখিয়ে দাও না!

লাবণ্য দাঁড়িয়ে আছে বাঁশের খুঁটি ধরে। লাল ডুরে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো। গাছকোমর বেঁধে শাড়ি পরা। ছলছল করছে দু'চোখ। বলল, দ্বিজুদা, ওরা হয়তো আসতে দেবে না আর। আমার কেমন ভয়-ভয় করছে। তুমি অমত করলে কেন মায়ের কাছে ?

—পাগলী কোথাকার। ভয় কিসের রে ? ছেলে তো বেশ সুপুরুষ। পয়সাঅলা লোকের ম্যানেজার। পাথরেঘাটার কন্দর্পনারায়ণ রায়চৌধুরীর বাড়িতে কাজ করে। তুই তো রানী হবি রে। ভাবছিস—আমি যাবো না ? দেখিস, যাবো।

ঝর ঝর করে ঝরে পড়ল লাবণ্যর দু'চোখের জল।

খোড়োচালের ঘর। মাটির দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুরের ওপর বসেছিল দ্বিজদাস। গায়ে ফতুয়া পরনে মোটা সুতোর ধুতি। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল। দ্বিজদাস উঠে দাঁড়াল। লাবণ্যর মাথায় হাত দিয়ে বলল, শোন্, তোকে একটা ভালো গান শিখিয়ে দেব। চোখ মোছ দিকিনি শিগগির।

—ছাই শেখাবে! একটার তো আধখানাই হয়ে রইলো, শেষ আর হল না। গান শিখে আর কি হবে ? দেশ থেকে বিদেয় করে দিতে পারলে বাঁচো তোমরা। সবাইকে চিনে নিয়েছি।

—মাসিমা আসছে লাবণ্য, চোখ মোছ্।

—আসুক না। কে কত আমার দিকে ফিরে চাইল!

লাবণ্যর মা এলো। হাতে একটা ছোট বেলেপাথরের বাটিতে কলাপাতা ঢাকা মোচার ঘণ্ট। দ্বিজদাস ভালোবাসে বলে এনেছে। বাড়িতে রান্না হলেই লাবণ্যর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। আজও লাবণ্যকে আসতে বলেছে। লাবণ্যকে ডেকে ডেকে সারা। বাড়ির ত্রিসীমানায় খুঁজে পায়নি মেয়েকে। অগত্যা নিজেই এসেছে তাই।

মেয়েকে দেখে মা বলল, বেশ মেয়ে তুই যাহোক। এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছিস, অথচ নিয়ে এলিনি ?

—আর দশ-বারোদিন তো আছি, এরপর কে নিয়ে আসবে ?

মেয়ের চোখে কান্না গলায় কান্না। মায়ের চোখে জল এলো।

মায়ের ইচ্ছে ছিল দ্বিজদাসের সঙ্গে লাবণ্যর বিয়ে হয়। মা-বাপ মরা ছেলে। স্বভাব-চরিত্রের তুলনা হয় না। চাঁদে কলঙ্ক আছে কিন্তু দ্বিজদাসের নেই। গান-পাগল মানুষ। ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্ণৌ-দিল্লি ঘুরে ঘুরে গান শিখেছে। গলা কি—শুনলে বনের পশুও বশ মানে।

গান কিছু বোঝে না মা। তবে সুর শুনলে কখনো কান্না কখনো আনন্দ আসে। সুরের কান্নায়ও কত শান্তি ঢালা। বাবাকে অনেক বুঝিয়েছে মা, বরাতে যদি সুখ থাকে—দ্বিজুই লাবণ্যকে সুখী করবে।

বাবার ধনুক-ভাঙা পণ। ছেলে ভালো দেখলেই হল। একটা ছেলে

হলে খাওয়াতে পারবে না। গান গেয়ে রোজগার করবে—এ আকাশকুসুম চিন্তা করে, মেয়ে ফেলে রাখা যায় না। সুযোগ এসেছে যখন, ছাড়া উচিত নয়।

কথা দিয়েছে বাবা, হুকুম টলবে তো হাকিম টলবে না।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, বাবা দ্বিজু, বললুম, দুজনে চলে যাও দেশ ছেড়ে, শুনলে না।

লাবণ্যর বুকচাপা অভিমান ভেঙে খান খান হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল প্রতি কথায়!

—তোমার কথা শুনবে কেন? ওই-ই তো পাকচক্র বাধিয়ে দিল আরো ভালো করে। হাত টিপে বারণ করলুম। তবু বলল। আধবুড়ো লোকটাকে আমার ভালো লাগেনি। একটা যমদূত। কেবলি কট কট করে তাকাচ্ছিল। তখুনি বুকে কাঁপুনি ধরেছে আমার। দ্বিজুদাকে বললুম, মেলা দেখে আর দরকার নেই। শুনল কথা? উল্টে বলল, ভদ্রলোকের কথাবার্তা বড় ভালো। তোকে কত সম্মান দিয়ে কথা বলল দেখলি না? মালক্ষ্মীর থাকা হয় কোথায়? তাই থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন উনি। একেবারে দেশছাড়া।

মাথা নিচু করে মৌনমুখে দাঁড়িয়ে রইল দ্বিজদাস।

বলার কিছু নেই তার। ভবিতব্য না হলে মেলা দেখতে গেল কেন? লাবণ্য তো বলেছিল, যেয়ে দরকার নেই। কদিন আগে সর্দিজ্বর হয়েছিল। ইন্দ্রপরবে বৃষ্টি হবেই। ভিজলে ভুগবে আবার।

দ্বিজদাস শোনেনি। প্রতি বছর যায়। মা যতদিন বেঁচে থেকেছে—শরীরে শক্তি ছিল—এক বছরও বাদ পড়েনি। গেছে মায়ের কথা মনে করেই। লাবণ্য সঙ্গ নিয়েছে, একে দুর্বল—একা যাওয়া ঠিক হবে না।

ডালপালাশূন্য শালগাছটাকে মাটিতে পোঁতা হয়েছে। গাছের মাথায় ঝালর-দেয়া হলদে ছাতা। তার তলায় একটা ধ্বজা। ইন্দ্রধ্বজা। পুরোহিত গাছে হলুদ কাপড় আর মালা জড়িয়ে দিয়ে পুজো শুরু করেছে, খাওড়ার ক্ষত্রিয়রা—এককালের রাজাদের জ্ঞাতি-স্বজন এলো ইন্দ্রপুজোর উৎসবে। প্রত্যেক বছরে ভাদ্রের শুক্লা একাদশীতে এই ইন্দ্রপরবে—সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করার জন্য আসে ওরা।

চতুর্দিকে মেলা বসেছে। নাগরদোলা ঘোড়দৌড় ম্যাজিক দোকানপসারী। সমস্ত বাঁকুড়াটা ভেঙে পড়েছে এই একটি মাত্র জায়গায়।

ক্ষত্রিয়রা আসছে। আগে আগে বাজনা বাজছে। ঢাক-ঢোল কাঁসর ঘণ্টা ব্যাণ্ড ব্যাগ-পাইপ। মাঝখানে পথ করে দিয়ে দুপাশে লোক সরে গেল। ক্ষত্রিয়রা ইন্দ্রগাছের কাছে পুজো দেখতে গেল।

পুজো সেরে চলে গেল ওরা।

সাঁওতালী মেয়ে-ছেলেরা মাদলের তালে তালে নাচতে শুরু করেছে ইন্দ্র-

গাছকে ঘিরে। হালকা ফিকে কালো মেঘ থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি ঝরছে।

দেখা নাচ। তবু এই দিনটিতে সুন্দর লাগে, নতুন মনে হয়। মনে হয় বৃষ্টির সঙ্গে ফসলের প্রাণ ইন্দ্রদেব পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসছেন।

দ্বিজদাস নাচ দেখছে। নেচে-নেচে সাঁওতালরা ইন্দ্রদেবের পুজো করছে। পাশে এসে দাঁড়াল প্রৌঢ়। অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে দেখল লাবণ্যকে। তারপর ঠিকানা জানতে চাইল। দ্বিজদাসের মনে হয়েছে, হয়তো কোন পাত্র হাতে আছে প্রৌঢ়ের। পাত্রের পছন্দসই কিনা, তাই অত দেখাদেখি। একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পরই ঠিকানার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

ইচ্ছে করেই দিয়েছে দ্বিজদাস। তার ঘরে লাবণ্যকে চিরকাল দুঃখের বোঝাই বইতে হবে। সুখী কোথাও হয় যদি হোক না। তাতে তো তারও সুখ।

প্রৌঢ় ইন্দ্রপরব দেখতে এসেছিল তার এক জানাশোনা লোকের মুখে শুনে। ফেরার সময় ঘটকের কাজ করে গেছে লাবণ্যর বাবার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে। দু-দিন যেতে না যেতেই পাত্রপক্ষ পাত্র—সবাই এসে হাজির। এক পয়সা খরচা নয়। লক্ষ্মী প্রতিমাকে সোনায় মুড়ে নিয়ে যাবে।

মা এসে বলেছে, দ্বিজু লাবণ্য কেঁদেকেটে খুন। পেটে অন্ন যাচ্ছে না দু'দিন। যা হয় ব্যবস্থা কর একটা, আমি তোমার সহায়। কর্তার আপত্তি যখন, ওকে কোথাও সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর।

—তা হয় না মাসিমা। গ্রামের লোক যা-তা বলবে। ওর বরাতে সুখ যেখানে, কেন দুঃখের আগুনে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারতে চান আপনি? আমি পারবো না।

কোনটা সুখ কোনটা দুঃখ বুঝতে পারছি না বাবা। গলা ভেঙে এলো মায়ের। চোখের কোণ চিকচিক করে উঠল। মাথায় ঘোমটা টেনে ছিটে-বেড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে মা।

তারপর সপ্তাখানেকের মধ্যে পাকা দেখা হয়ে গেল। বাতের শরীর তবুও লাঠিতে ভর দিয়ে লাবণ্যর চিবুক ধরে আদর করে বলল কন্দর্পনারায়ণ, হরকিশোরের সঙ্গে মানাবে ভালো! কুষ্ঠিতেও রাজযোটক মিল।

বসতে পারে না, কোমরে ব্যথা। তাই দাঁড়িয়েই লাবণ্যর গলায় গিনির মালা পরিয়ে দিয়েছে কন্দর্পনারায়ণ। মাথায় ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেছে। শাঁখ বেজে উঠেছে। লাবণ্যর দু'চোখের জল পড়েছে টপটপ করে। মায়েরও। কেবল পড়েনি দ্বিজদাসের। শুধু চোখ কেন—তার ভেতরটা কার যেন নির্দয় নিশ্বাসে শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে।

সরস্বতীর পুজারী সে। সরস্বতীর রূপ চিন্তা করে প্রার্থনা করেছে মনে মনে—লাবণ্য রানী হোক, লাবণ্যর শান্তির সংসার হোক, সুখের সংসার হোক!

—বাবা! ওর কথায় দুঃখ করো না।

মায়ের কথা কানে যেতে চিন্তার রাজ্য থেকে ফিরে এলো দ্বিজদাস। নিজে ভুল করেছে কি ঠিক করেছে বিচারের মানদণ্ড থেকে মন ফেরাল। বলল, মাসিমা, সত্যি বলছি, আমি দুঃখ করিনি।

—ঘণ্টটা ঘরের মধ্যে রেখে গেলুম বাবা, খেও।

যাওয়ার সময় লাবণ্য বলে গেল, দ্বিজুদা, মনে কিছু করো না। মাথাটা কিরকম হয়ে গেল। কত কথা শোনালুম মিছিমিছি।

বিয়ের চারদিন বাকি।

এসেছে লাবণ্য। বলেছে, দ্বিজুদা, বারণ করছে আসতে সবাই। শ্বশুর-বাড়ির লোকের কানে যদি যায়, আশীর্বাদের পরও মেয়ে পাড়া-ঘরে বেড়িয়ে বেড়ায়, তাহলে ভেঙে যেতেও পারে নাকি!

দ্বিজদাস গম্ভীর মুখে বলেছে, তোমার আসাটা ঠিক হয়নি।

—ভাঙুক না। ভাঙলেই তো ভালো! দ্বিজুদা, আর তিনদিন বাকি, গানটার শেষটুকু শিখিয়ে দাও না। আকাশে কালো মেঘ এলে বৃষ্টি নামে যেমন, ভেতরে কৃষ্ণ এলে চোখের জল ঝরে তেমনি।…'ঘনশ্যাম হ্যায় দিলমে, ঘনশ্যাম না হোতে তো এক বর্ষাত না হোতি।' এর পরে?

মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক দ্বিজদাস। তানপুরা নিয়ে বসল। প্রথম লাইন গাইতে বন্যার বাঁধ ভাঙল দু'চোখে। গলা বুজে এলো। গাইতে পারল না। উঠে, ঘরে পালিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছে, লাবণ্য বাড়ি যা। এখন গানের মেজাজ আসছে না। কাল আসিস। দু'চোখের জলে বুক ভেসেছে লাবণ্যর। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চতুর্দিকে ঝাপসা দেখেছে।

বিয়েব আগের দিন পর্যন্ত এসেছে লাবণ্য। দুজনের একই দশা হয়েছে পর পর তিনদিন। গাইতে পারেনি দ্বিজদাস। লাবণ্যর গান শোনা আর হয়নি। বাকিটুকু শেখা আর হয়নি।

বিয়ের সময় এসেছে দ্বিজদাস লাবণ্যদের বাড়িতে। বর-কনের বাসর ঘরে যাওয়া অবধি থেকেছে।

ফিরে যাওয়ার সময় সারাটা পথ একটা বোবাকান্না ভেতরে মাথা কুটেছে। বাতাসে চুল পোড়ার গন্ধ। মনের ভুল বুঝতে পারেনি। যতবার নিশ্বাস নিয়েছে, ততবার ওই গন্ধ।

রাত্তিরে ঘুমোতে পারেনি। অনবরত গন্ধ পেয়েছে আর মনে পড়েছে ছাদনাতলার দৃশ্য। মাসিমার ত্রাস।

ছাদনাতলায় বর-বরণের সময় একটা মানুষ জ্যান্ত পুড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। মাসিমা বরণ করতে করতে বরণডালার প্রদীপের শিখায় আগুন ধরে যায় আঁচলে। নেভাতে নেভাতে মাথার বাঁ পাশের চুলও পুড়েছে।…

মাসিমার ঘরে যেতে বলেছে, কেন এমন অলক্ষুণে কাণ্ড হল বাবা! প্রতিমার কথা মনে হচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, প্রতিমার সর্বাঙ্গ জ্বলে

উঠেছিল। দাউ দাউ করে। প্রদীপের আগুনেই জ্বলে ছিল। ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে গিয়ে—সেও আঁচলে আগুন ধরে যায়।

প্রতিমা লাবণ্যর বড়। বছর দুয়েকের। আজ বেঁচে থাকলে আঠারোয় পড়ত। আট বছর আগে চলে গেছে।

এসব চিন্তা মন থেকে সরাতে চেষ্টা করেছে দ্বিজদাস। মনকে বুঝিয়েছে খালি—এ সমস্ত কিছু নয়। লাবণ্যর শুভ-অশুভর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। মঙ্গলই হবে।

গাঁ থেকে লাবণ্য চলে যাওয়ার পর মন বসাতে পারেনি দ্বিজদাস তার ভাঙা-নড়বড়ে ঘরে আর। তানপুরা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নিরুদ্দেশের পথে।

কোথায় যাবে—জানে না। ট্রেনে উঠে বসে আছে। ট্রেন চলছে, অতীতের ছবি এক একটা ভেসে উঠছে মনে। এরকম কতক্ষণ যে কেটেছে, ঠিক বলা যায় না। তবে বেশ খানিক!

হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল সমস্ত ছবি। চেকার বলছে, বেশ লোক তো! টিকিট-টিকিট করে চিৎকার করছি সেই থেকে, গ্রাহ্য নেই। কালা নাকি?

থতমত খেয়ে দ্বিজদাস বলল, না, কালা নই।

—তবে টিকিট দিচ্ছো না কেন!

—টিকিট তো কাটা হয়নি।

—আহা, ন্যাকা! শ্বশুরবাড়ির গাড়ি পেয়েছো নাকি? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। পাশে আবার ওটা কি?

—তানপুরা।

—কার?

—আমার।

—তোমার? কখখোনো না। বিনা টিকিটে গাড়ি চড়েছে—তানপুরা নাকি ওঁর! নিশ্চয় চুরি।

—দেখুন, মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি! চোর আমি নই।

—না, তুমি সাধু! বুঝতেই পারছি। টিকিট ফাঁকি দেয়া - পয়সা বার কর দিকিনি।

—পয়সা নেই।

—চালাকি পেয়েছ! পুলিসে দেব তোমায়।

রাইনগর স্টেশনে এসে মহা হৈ-চৈ কাণ্ড। চেকার এই মারে তো সেই মারে। স্টেশনে নামিয়ে চিৎকার করে চড় মেরে, দ্বিজদাসকে চোর সাব্যস্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগল চেকার।

চেকারের দলেই অনেকে এলো। ওরা মারমুখী। দুএকজন কিল লাথি

বসিয়ে দিল দ্বিজদাসের পিঠে বুকে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাস্টার দৌড়ে এলো, বলল, আচ্ছা, এত হুজ্জুতের কি আছে? লোকটা সত্যিসত্যি গান জানে কিনা পরখ করে দেখলেই বোঝা যাবে, তানপুরা ওর নিজস্ব কি চুরি করা। ও যখন বলছে, ও গান জানে—তানপুরায় গায়।

স্টেশনমাস্টারের এ যুক্তি সকলে মেনে নিলেও চেকারের দাবি—টিকিটের ফয়সালা হবে কেমন করে?

স্টেশনমাস্টার বলল, গানের কথা ওর সত্যি হলে—যা লাগে আমি দিয়ে দেব।

স্টেশনের প্ল্যাটফরমে বসেই গান ধরল দ্বিজদাস, তানপুরার তারে আঙুলের পরশ হালকা সাদা পালক বোলাচ্ছে যেন।

গান শুনে শুধু স্টেশনমাস্টার নয়, প্রত্যেকেই মুগ্ধ।

এর পর দ্বিজদাস স্টেশনমাস্টারের কোয়ার্টাসে ঠাঁই পেল। যেতে চায়নি। স্টেশনমাস্টার রমেন জোর করে ধরে নিয়ে গেল দ্বিজদাসকে। এমন গুণীকে রাস্তায় হারিয়ে যেতে দেবে না সে। দিতে পারে না প্রাণ থাকতে।

রমেনের কোয়ার্টারে যে ঘরে থাকার ব্যবস্থা হল দ্বিজদাসের—সে ঘরের দেয়ালে একটা তানপুরা ঝুলছে, কালো ঝুলে ভর্তি। দেখে, চোখে জল এলো দ্বিজদাসের।

লক্ষ্য এড়ায়নি রমেনের। বলল, এক সময় চর্চা ছিল। সংসারের যাঁতাকলে পড়ে আমি মরে গেছি ভাই। দেখি, তোমাকে নিয়ে যদি রেওরাজে মন বসে আমার।

কদিন কেটে গেছে, রমেন রেওয়াজে মন বসাতে পারেনি। বাইরের ঘরে দুজনে মুখোমুখি হয়ে দ্বিজদাসের জীবন-যন্ত্রণার কথা শুনেছে শুধু। শুনতে শুনতে বুকভাঙা নিশ্বাস ঝরে পড়েছে। একটা কিছু বলি বলি করেও বলতে পারেনি। জিভের ডগায় আটকেছে।

বেশিদিন আটকে থাকেনি, প্রকাশ হয়ে পড়েছে পূর্ণিমার মাঝরাতে। জ্যোৎস্নার ফিনকি ফুটেছে। মাঠ পথ ফুলের বাগান ক্ষেত—সব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে দ্বিজদাসকে। দ্বিজদাস জেগে ছিল। জানলা দিয়ে দেখছিল—যতদূর চোখ যায়।

চার দেওয়ালের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখতে ইচ্ছে করছে না একদম। মুক্ত আকাশের নীচে বসে সুর ভাঁজতে ইচ্ছে করছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল।

রমেনকে সঙ্গে নেয়ার জন্য ভেতরের দরজা খুলতেই বিস্ময়-বিমূঢ়। দালানে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রমেন। সামনে হুইস্কির বোতল। আধগেলাস হুইস্কি রয়েছে টেবিলের ওপর। রমেনের ঠোঁটে চাপা সিগারেটের লাল আগুনটা জোর হয়ে উঠে কমে যাচ্ছে। দক্ষিণের দরজা বন্ধ ঘর থেকে স্ত্রীলোকের

চাপাকান্না ভেসে আসছে। থ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দ্বিজদাস।

ছাদঢাকা দালানে আলো-আঁধারি।

রমেনের দেহের ওপর দিকটায় আবছা অন্ধকার, নিচের দিকে পূর্ণিমার আলো। গান গাওয়ার মনোভাব হারিয়ে গেছে দ্বিজদাসের। বাতাসটা কেমন ভারী লাগছে। একটা বিষাদ একটা অবসাদ ছেয়ে ফেলেছে।

সামনের চেয়ারে বসতে বলল রমেন। বলল, আমার স্ত্রী কাঁদছে। এ কান্না কবে থামবে জানি না।

কান্নার আওয়াজ একটু জোরে শোনা গেল। গেলাসের হুইস্কিটা ঢকঢক করে রমেন গলায় ঢেলে দিল। ঠক করে টেবিলের ওপর গেলাসটা বসিয়ে দিয়ে বলল, দ্বিজদাসবাবু, কান্নাটা একটু কমেছে না? দ্বিজদাসের উত্তরের অপেক্ষা না করে বলল, হুঁ, থেমেছে। আধগেলাস অবধি হুইস্কি ঢালল।—জানেন? আমার ভেতরের জ্বালা জুড়িয়ে দেয় এই জিনিস। গেলাসটা ঠোঁটে ঠেকাল আবার।

দ্বিজদাস কোথায় বসে আছে, কার কাছে বসে আছে। রমেনের স্ত্রীর কান্নায় লাবণ্যর কান্না শুনছে যে। ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠেছে।

রমেন কাঁদছে হাউ হাউ করে।—ফুটফুটে সোনার চাঁদ আমার হারিয়ে গেল পাঁচ বছর বয়সে। শোক সামলাতে পারল না স্ত্রী। বলে, বিনা চিকিৎসায় চলে গেল বাছা। বলুন তো, আমার অন্যায় আছে কিছু? সবে জ্বর শুরু হল, ডাক্তার নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেখি চলে গেছে গোপাল!

গেলাসে হুইস্কি ঢেলে, এগিয়ে দিল রমেন দ্বিজদাসের দিকে। ধরুন, আপনারও জ্বালা জুড়োবে। ধরুন।

—সত্যি জুড়োবে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হাত বাড়াল দ্বিজদাস।

গ্রামের একজন সঙ্গীত-প্রিয় করিৎকর্মা লোক ভূধর দাশ। দ্বিজদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করিয়ে দিয়েছে রমেন। কলকাতায় সঙ্গীতমহলের বড় বড় রথীমহারথীর বাড়িতে অবারিত দ্বার তার।

সঙ্গীত জগতে দ্বিজদাসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভূধরের চেষ্টায় কোন খাদ মিশেল নেই। নিখাদ আন্তরিক। সঙ্গে করে নিয়ে যায়, আলাপ-পরিচয় করিয়ে দেয় সকলের সঙ্গে। দ্বিজদাসের বিনয় দেখে, অতিরাগী ওস্তাদজীরও হৃদয় গলে। মাথায় হাত রেখে, আশীর্বাদ করে বলে—বেটা, ওস্তাদ বন্ যাও!

সত্যিসত্যিই সবার সহানুভূতি সবার ভালোবাসায় ক'বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পেল দ্বিজদাস উঁচুদের গাইয়ে মহলে। বনেদি ধনীলোকের বাড়িতে দ্বিজদাস ওস্তাদ না হলে চলবে না। বিয়ে অন্নপ্রাশন আনন্দ উৎসব—সবেতেই দ্বিজ-দাসকে চাই। দ্বিজদাস না হলে, শিবহীন যজ্ঞ। দ্বিজদাসের গান শোনার

জন্যে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো— সকলেই পাগল! ধনীলোকের সখের উৎসব বেরাল-কুকুরের বিয়েতে—যেখানে বড়লোকমি দেখাবার জন্য লাখ-লাখ টাকা খরচ—সেখানেও সবার প্রিয় দ্বিজদাসের উপস্থিতি না হলে আবার মানায় না। ঈশ্বর সুপুরুষ চেহারাই দেয়নি কেবল দ্বিজদাসকে, দরদীকণ্ঠের অধিকারীও করেছে। দ্বিজদাস দ্বিজদাসই তুলনা মেলা ভার।

আকাশে বাতাসে যখন দ্বিজদাস-মাহাত্ম্যের প্রচার চলছে সর্বক্ষণ, তখন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল।

সারাদিন শ্রাবণের ধারা ঝরেছে, সন্ধ্যেয় মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বরানগরের বাগানবাড়িতে গানের জলসা। আসতে হয়েছে দ্বিজদাসকে। স্বেচ্ছায় আসেনি, পয়সা বেশি দেবে বলে—তাও নয়। এখন পয়সার অভাব নেই। কথায় বলে না—বিধি যখন মাপান, তখন উপরি-উপরি চাপান। দ্বিজদাসের ঘরে তো পয়সাবৃষ্টি হচ্ছেই। তবে? একজন ধরে-বেঁধে যাকে বলে—তাই এনেছে দ্বিজদাসকে। বিপদের বন্ধু রমেনকে দিয়ে আসতে বলিয়েছে। সকলের কথা ফেলতে পারে দ্বিজদাস, মরে গেলেও রমেনের কথা বাতিল করতে পারে না, পারবে না। এসেছে।

চতুর্দিকে উঁচু পাঁচিল-ঘেরা বিরাট জায়গা। নানা গাছ ঘেরা মধ্যিখানের বাড়িটা রাজপ্রাসাদ। দোতলার মার্বেল মোড়া লাল কার্পেট বিছানো ঘর থেকে ফুলবাগানের সুন্দর দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। চোখে নানা রঙের ফুল, নাকে মন-মাতানো মিষ্টি সুবাস। ঘর ভর্তি লোক।

সারেঙ্গী তবলা হারমোনিয়াম আর তানপুরা— এক সুরে বাঁধা হচ্ছে। সুরের আবহাওয়া গোটা হল ঘরটায় ভরে উঠেছে। মাথার ওপর ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলছে, কোণে-কোণে শ্বেতপাথরের মানুষপ্রমাণ উঁচু ডানাঅলা পরী। প্রত্যেকের ডান হাতে বিজলীবাতি—নীল-লাল-হলুদ-সবুজ।

ঘরের ওপর-নিচে—চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার দ্বিজদাস। ভেতরে দারুণ অস্বস্তি, বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না। বুকের কাছটায় একটা দুঃসহ যন্ত্রণা। হৃৎপিণ্ডটা কে যেন মুঠোয় পুরে দলছে, পিষছে। একটা গেলাস মুখে তুলছে। রাক্ষুসে মদ গেলা যাকে বলে। তবু স্বস্তি পাচ্ছে না। যন্ত্রণা কমছে না। যন্ত্রণার উর্ধ্বগতি গলায় এসে আটকাচ্ছে। আটকানো বাড়ছে ক্রমে।

কন্দর্পনারায়ণ লাল ভেলভেটের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে, মুখে রুপোর গড়গড়ার সোনা বাঁধানো নল। তামাকের ধোঁয়ায় গোলাপ-আতরের খোশবাই। আড়চোখে দেখছে এদিক-ওদিক। মৃদু-মৃদু হাসছে।

হরকিশোরের মালিক কন্দর্পনারায়ণ। হরকিশোর ম্যানেজার, লাবণ্যর স্বামী। কন্দর্পনারায়ণের চেনার কথা নয় দ্বিজদাসকে। লাবণ্যর আশীর্বাদের সময় একবারটির জন্য গেলেও চোখাচোখি সামনাসামনি পরিচয়—কোন কিছুই

হয়নি দ্বিজদাসের সঙ্গে। দ্বিজদাস দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছিল। হরকিশোর আসেনি। এলেও, এ আসরে চিনতে পারত না তাকে। বিয়ের সময় তার সঙ্গেও তো আলাপ হয়নি। দ্বিজদাস দূরে দূরেই থেকেছে।

দ্বিজদাসের ঘাড় অবধি বাবরি চুল। পরনে পাজামা-আচকান। একেবারে পশ্চিমী ঘরানার পোশাক। চেনা লোকেরও টপ করে চেনা মুশকিল। এ বাড়ির বৌ লাবণ্য। অবিশ্যি এটা ওদের বাগানবাড়ি। থাকে পাথরে-ঘাটায়। ঘরের বৌ মাইফেলে আসবে না, এই একটা নিশ্চিন্ত।

দেখতে ইচ্ছে করে লাবণ্যকে। সময়-সময় মন ছুটে চলে যায় ওর কাছে। কিন্তু দেহ যেতে চায় না, যাব বলে কথা দেয়া ছিল, মনে হলেও না। বেশ আছে। দেখলে, আবার কান্নাকাটি করবে লাবণ্য। পুরনো ক্ষতে নতুন করে আঘাত করা স্রেফ।

লাবণ্যর কথা বড্ড বেশি মনে পড়ছে। লাবণ্যর জন্যই আসতে চায়নি দ্বিজদাস। সেই আসতে হল।

সকলের দিক থেকে অনুরোধ আসছে, কন্দর্পনারায়ণের তরফ থেকেও—সর্বপ্রথম দ্বিজদাসকে গাইতে হবে। তারপর অন্যেরা। তানপুরা হাতে তুলে নিল দ্বিজদাস। মাথা নিচু করে নমস্কার জানাল সবাইকে।

কোন গানের কলিই মনে আসছে না দ্বিজদাসের। একটাই বার বার ভেসে আসছে। যে গানের বাকিটুকু লাবণ্যকে শেখানো হয়নি। নিজের অগোচরেই দ্বিজদাস গাইছে। কে যেন জোর করে গাওয়াচ্ছে তাকে।…'ঘনশ্যাম হ্যায় দিলমে, ঘনশ্যাম না হোতে তো এক বর্যাত না হোতি।' দু'চোখ বুজে গাইছে দ্বিজদাস।

দ্বিজদাস কল্পনায় দেখছে লাবণ্য আসছে। ঝুম ঝুম করে ঘুঙুরের আওয়াজ কানে বাজছে। মৃদু থেকে জোরে আরো জোরে আরো জোরে। চলার তালে তালে কথক নাচের বোল উঠছে। থামল। কন্দর্পনারায়ণের পাশে বসল; কি সুন্দর দেখাচ্ছে। লাল সিল্কের জরির বুটি বসানো পাতলা ওড়না একবার করে ঢেকে দিচ্ছে মুখে, একবার করে খুলছে। রূপসী লাবণ্য-অপরূপা-লাবণ্যময়ী হয়ে উঠেছে। হাত-কান-নাক-গলা থেকে হীরের রামধনু রঙ ঠিকরোচ্ছে পঙ্কের কাজ করা উজ্জ্বল দেয়ালে মানুষের মাথায় চোখে মুখে।

গানের শেষের কলির লাইনটা গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল লাবণ্যর গলা। তার গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে লাবণ্য। গলাটা একটু ধরা-ধরা—কান্না জমা। দ্বিজদাস অস্থির হয়ে পড়ল। গান থামাল, শেষ করা আর হল না—চোখ খুলে তাকাতেই পাথর হয়ে গেল। বাইজির বেশে কন্দর্পনারায়ণের পাশে বসে আছে সত্যি সত্যিই লাবণ্য, গাইছিল তার সঙ্গে। ঠোঁটে কাঁপুনির রেশ লেগে রয়েছে। সুর্মা-পরা চোখে জল টলমল করছে।

একি দেখছে—সত্যি না স্বপ্ন? মাথার ভেতর কি রকম করছে। পাশের

লোকেরা কানের কাছে ফিসফিস করে বলছে, গাইয়ে গাইয়ে। পাপিয়াবাইয়ের নজর পড়েছে। রাজস্টেটের বাঁধা ওস্তাদ হয়ে যাবেন মশাই। আপনার গলা গান ভালো লেগে গেছে পাপিয়ার। তা নাহলে সঙ্গে গলা দেয়! ওকে বিখ্যাত বাইজি করার পেছনে দিল্লি লক্ষ্ণৌ—কোন্ জায়গা থেকে না বড় বড় ওস্তাদ আনিয়েছে রায়চৌধুরীমশাই। অঢেল টাকা ঢেলেছে পাপিয়ার পেছনে। দ্বিজদাসের কানে টুকরো টুকরো কথা যাচ্ছে। চোখে অন্ধকার নামছে। হরকিশোরের বৌ লাবণ্য বাইজি—পাপিয়াবাই। না, না। যা শুনছে যা দেখছে ভুল।

বাইরে শ্রাবণের বৃষ্টি, ভেতরে ঘেমে নেয়ে উঠছে দ্বিজদাস। সর্বশরীর ঝিমঝিম করছে। নিজের দেহ নিজের নয়, নিজে নিজের নয়।

কার্পেটের ওপর ঢলে পড়ছিল দ্বিজদাস, পাশের জওয়ান ধরে ফেলে শুইয়ে দিল।

জ্ঞান হতে দেখেছে দ্বিজদাস, মখমলের বিছানায় শুয়ে। মেহগনি কাঠের আয়না আঁটা খাটে। শিয়রে বসে লাবণ্য। মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর চোখের জলে ভাসছে।

দ্বিজদাস যা দেখছে, যা দেখেছে সব সত্যি।

শুনেছে লাবণ্যর করুণ কাহিনী।

হরকিশোর দালাল। কন্দর্পনারায়ণের পেটোয়া লোক। মিথ্যে বিয়ে করে এনে ভোগের বস্তু হিসেবে রায়চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়েছে। তাকে উদ্ধার করতে পারে না কি দ্বিজুদা?

ইলমদার ওস্তাদ! পাপিয়ার ইলম্ নেয়া দরকার এর কাছে। এমন গুণীকে আটকে রাখতে হবে। মদে টর হয়ে যে গান শেষ করতে পারেনি, বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল, সে-গান সম্পূর্ণ নিয়ে তবে একে ছুটি দেয়া।

কন্দর্পনারায়ণ পাপিয়ার মুঠোয়। হেসে বলেছে, পাপিয়ার জো মর্জি!

এই সুযোগ। এ সুযোগ নিতে হবে দ্বিজুদাকে।

কূটনীতিতে কত বড় নিপুণ কন্দর্পনারায়ণ—পাপিয়া ভাবতে পারেনি।

দেওয়ালেরও কান আছে। এখানে এটা বেশি করে খাটল, কন্দর্পনারায়ণের সন্দেহ জাগে দ্বিজদাস ওস্তাদের ওপর পাপিয়া বাইয়ের আকুলি-বিকুলির জন্য। এত ওস্তাদ এসেছে, এমন মর্মছেঁড়া টান কারো ওপর দেখিনি। কন্দর্পনারায়ণ বললেও, নিজের ঘরের তো কথাই ওঠে না। নিজের মহলে চাকরবাকরদের ঘরেও রাখতে রাজী হয়নি। সে কি রাগ। এর বেলা উল্টো।

ঘরের আনাচে-কানাচে পরদার পাশে পাশে লোক ঘোরাঘুরি করছে। কন্দর্পনারায়ণের দু চক্ষু নয়, শত চক্ষু, শত কান।

কানাকানি হতে হতে কন্দর্পনারায়ণের কানে গিয়ে পৌঁছল ওদের পালানোর

কথা। কন্দর্পনারায়ণের মাথায় রক্ত চড়ল। বিষবৃক্ষকে একতিল আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়।

রাতে পাপিয়াবাইয়ের মনে হল, কাদের নিশ্বাস যেন শুনতে পাচ্ছে। একসঙ্গে অনেকের। ঘরের পরদা সরিয়ে উঁকি মেরে দেখল, দেখতে পেল না কাউকে। তবু ভয় গেল না। ধুরন্ধর কন্দর্পনারায়ণের লোক পাঠানো বিচিত্র নয়। তারা কি করছে, না করছে দেখার জন্য পাঠাতে পারে। ওস্তাদ দুর্বল, দেখাদেখির জন্য এ ঘরে রাখার অনুমতি আদায় করে নিয়েছে পাপিয়াবাই কন্দর্পনারায়ণের কাছ থেকে। তবু ওকে বিশ্বাস নেই। বড্ড সন্দিগ্ধ মনের মানুষ।

চাপা গলায় বলল পাপিয়াবাই, দ্বিজুদা, কারা যেন আসা-যাওয়া করছে। তুমি গানটা ধর। আমি যেন শিখছি বসে।

গান ধরেছে দ্বিজদাস। · 'ঘনশ্যাম হ্যায় দিলমে, ঘনশ্যাম না হোতে তো এক বর্যাত না হোতি'। দ্বিতীয় লাইন আর গাইতে হল না দ্বিজদাসকে। কালো আলখাল্লা পরা, মুখে কালিমাখা এক ভীষণ দর্শন জওয়ান পেছনের জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়েই সজোরে তলোয়ারের ঘা বসিয়ে দিল দ্বিজদাসের ঘাড়ে। মুখ দিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না দ্বিজদাস।

মূর্ছা গেল পাপিয়াবাই—দ্বিজদাসের লাবণ্য !

জানলার ধার থেকে সরে এলো অধীপ।

গলাটা বড্ড ব্যথা-ব্যথা করছে। নিজের ভেতর কে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করছে। —অধীপ কে তুমি ? তুমি কে ?

উত্তর আসছে—উত্তরও দিচ্ছে ভেতর থেকেই ভেতরে কে যেন।

তুমিই দ্বিজদাস, তুমি তুমি তুমি।

লাবণ্য কে ?

লাবণ্যই স্বপ্না, স্বপ্না স্বপ্না স্বপ্না।

অধীপের বুকের তলায় একটা পাগল-করা বেদনা গুমরে উঠছে। এক প্রান্তে স্বপ্না এক প্রান্তে অধীপ। কেন জানতে পারল অধীপ স্বপ্না কে ? কেন জানতে পারল নিজে কে ? না জানাই যে ছিল ভালো। চোখের জল বাগ মানছে না অধীপের। উপচে পড়ছে। স্থির হয়ে থাকতে পারছে না ঘরে। স্বপ্নাকে গান শোনাতে যাবে এখুনি। যে গানের শেষ শোনানো হয়নি লাবণ্যকে।

সব গানের চেয়ে এ গানটা অধীপের প্রিয়। প্রিয় মানে খুবই প্রিয়। মীর খাঁর কাছে গান শিখতে যখন, তখন মীর খাঁর মুখে একদিন শুনতে পেয়ে, এত ঝোঁক চেপে যায় সে, শেখা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত রাতেদিনে শান্তি-স্বস্তি পায়নি এতটুকু। খাওয়া ঘুম তো মাথায় উঠে গেছলো। এ গান শুনে যেমন আনন্দ পেয়েছে, শিখে তেমনি, গেয়ে তার চেয়েও শতগুণ। মনে হত, এ গানটা তার

প্রাণ তার মন তার দেহ। তার প্রেম-ভালোবাসা আত্মা।

স্বপ্নাকে গান শোনানোর জন্য হাসপাতালের কেবিনে গেছে অধীপ। গান শোনানো হয়নি। গভীর ঘুমে অচেতন স্বপ্না। মনমরা হয়ে ফিরেছে ঘরে।

স্বপ্নারা চলে যাবে আজ। আজ গলাটা বেশ ভালো। সরস্বতীদেবীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কাল রাতভোর কেঁদেছে অধীপ।—স্বপ্নাকে এ গানটা শোনাতে দাও তুমি আমায়। এর বিনিময়ে সারাজীবনের মতো গান বন্ধ করে দাও, গলা খারাপ করে দাও—ক্ষতি নেই। মা সরস্বতী স্বকর্ণে শুনেছে বুঝতেই পারা যাচ্ছে। না হলে কি হৃদয় গলে!

ছুটির আগে যে তিনটে দিন কেবিনে ছিল স্বপ্না, নিয়মিত গেছে অধীপ সকাল-বিকেল। স্বপ্না অনুরোধ করেছে গাইতে। গাওয়ার যে ইচ্ছে ছিল না অধীপের, তা নয়। ছিল বরং প্রবলই। কিন্তু গাইতে গিয়ে একই বিপত্তি। আগেকার অবস্থা। গলদঘর্ম, গলা ধরে যাওয়া। আর সেই সঙ্গে আশ্চর্যভাবে স্বপ্নার ঘুমিয়ে পড়া। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অঘোরে ঘুম।

অধীপের মনে হয়েছে স্বপ্না অন্তর্যামিনী। তার অবস্থা বুঝেই ঘুমিয়ে পড়ে। রেহাই দেয় অধীপকে।

তখনকার মতো চলে এলেও, নিজের শোবার ঘরে ঢুকেই গান শোনানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে অধীপ। ব্যর্থ চেষ্টা চলেছে পাঁচদিন ধরে—স্বপ্নার বাড়ি ফেরার পরের দু'দিনেও।

অধীপ আজ শোনাতে পারবে নিশ্চিত! সবুজ নরম ঘাসের ওপর, আলতো-আলতো পা ফেলে চলছে অধীপ। পূর্বা নাচ প্র্যাকটিস করছে। কথকের তাল পায়ের ঘুঙুরে দুলে দুলে উঠছে। স্বপ্না শিখিয়েছে মেয়েকে।

অধীপ এ বাড়ি থেকে নাচের আওয়াজ আর পাবে না কখনো। এদের কাউকে দেখতেও পাবে না আর।

ওপর দিকে তাকাল। জানলায় দাঁড়িয়ে স্বপ্না। দুটি চোখে তার অপেক্ষা। মুখেও বলল, আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আর চলেই তো যাচ্ছি, দেখা আর হবে কিনা জানি না। এমনিতেই তো সোনার কাঠি রুপোর কাঠি হয়ে আছে। পাখি উড়ে যাবে কখন আকাশে, আকাশে চোখ মেলে ধরল স্বপ্না। অধীপেরও দৃষ্টি আকাশে। ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘ আকাশময়। নীলের জাফরিতে সোনালী রোদের লুকোচুরি। চোখ নামিয়ে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল অধীপ। এলো দোতলায়।

ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে স্বপ্না। হাসতে হাসতে বলল, হাতে ত খানিক সময় আছে বেরোনোর।

স্বপ্না কি বলতে চাইছে, অধীপ বুঝেছে। বলল, ঠিক আছে।

বসার জন্য একটা বেতের মোড়া এগিয়ে দিয়ে নিজে একটায় বসল স্বপ্না।

অধীপের চোখের সামনে এক একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে।···কন্দর্পনারায়ণ—পাপিয়াবাই—দ্বিজদাস, পেছন থেকে তলোয়ারের কোপ।—অধীপের গলাটা কে যেন জোরে চেপে ধরেছে শক্ত হাতে। গাইতে দেবে না তাকে।

অধীপ গাইতে পারবে না। অসহ্য জ্বালা শুরু হয়ে গেছে গলায়। ঢোক গিলতে দারুণ ব্যথা। কেন গাইতে পারে না, সমস্ত জানিয়ে দেবে স্বপ্নাকে।

জানাতে পারল না। তার মন বলল, তোমার মধ্যে দ্বিজদাস জেগে উঠেছে। জাগার যাতনা যে কি, অনুভব করছ দিনরাত। স্বপ্নাকে কেন মিছে কষ্ট দেয়া আর! ওকে ভুলে থাকতে দাও। স্বপ্নার ভেতর আর লাবণ্যকে না-ই বা জাগিয়ে তুললে!

উঠে পড়ল অধীপ। বলল, দেখা করতে এসেছিলুম শুধু। গানটা অনেক বড়। সময় পেরিয়ে যেতে পারে।

অবাক চোখে চেয়ে রইল স্বপ্না।

বিচিত্র মানুষ। তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কত না চেষ্টা। হাসপাতালে দৌড়োদৌড়ি। গান শোনানোর বেলায় আগের আমলের গায়কের মেজাজ—কি কৃপণ!

সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে নামছে অধীপ। পায়ের তলার এক একটা ধাপ কাঁপতে কাঁপতে সরে যাচ্ছে যেন পেছনে।

তিন

প্রদীপের ঝাড়ের আরতি করলেন একসঙ্গে পূজারীরা। মনে হল, দেবলোক থেকে স্বয়ং বিশ্বনাথ নেমে এসেছেন এই পৃথিবীতে—এই কাশীধামে—এই বিশ্বনাথের মন্দিরে।

আরতির পরে পরিচয় হল আমার প্রাণেশের সঙ্গে। দু'চোখের জল টস্‌টস করে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। কে জানে পাথরের মধ্যে সজীব সচল সচেতন প্রাণের স্পর্শ পেয়েছে হয়তো বা ও। হতে পারে কল্পনা, হতে পারে অনুভূতি। যাই হোক না, যেখানে অশান্তির আগুনের দাহ থেকে নিষ্কৃতি নেই কারো, সেখানে একটু শান্তির রেশ একটু আনন্দের রেশ যদি ঘুরে বেড়ায় কারও মনে কোন মাহেন্দ্রক্ষণে—সেটা কম পাওয়া নয়। সে পাওয়াও অসম্ভব অনেকের পক্ষে। আমার ভালো লেগেছে প্রাণেশকে। জানি না ওরও ভালো লাগল কিনা আমায়। তবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এসে আমার সঙ্গে আলাপ জমাল।

মানুষের জীবনে যাতনা থাকে ব্যথা থাকে, থাকে অনেক কিছু। ইরাণীকে নিযে প্রাণেশের জীবনে এ এক বৈচিত্রময় জগৎ .....

দুর্যোগের রাত।

ঘূর্ণিঝড়ের দাপট কমেনি একটুও। থেকে থেকে বাড়ছে। রাস্তার ডানদিকের প্রত্যেকটা গাছই মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ফুটপাথের ওপর। ঝড়ের প্রতাপ যত ডানদিকে। ইরাণীর বাড়ির দিকে। বৃষ্টির জলে থৈ থৈ করছে রাস্তাঘাট।

এ রাত কাটবে না বুঝি।

ইরাণীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা। ঘূর্ণিঝড় স্নায়ুগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে পিষে ফেলছে যেন। বুকে তাকিয়া চেপে শুয়েছিল, শুতে পারল না আর। কেবলই মনে হচ্ছে, সে হয়তো আসছে। এখন আসা অসম্ভব জানে, তবুও মিথ্যে আসার আশা মন থেকে সরাতে পারছে না।

স্প্রিংয়ের খাটটা কেঁপে উঠল।

সর্বশরীর কেঁপে উঠল ইরাণীর। নামার মুখে এমন হয়, কখনো ভয় ধরেনি। আজ ধরছে। যাকে অবহেলা করেছে একদিন, যাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাকেই কাছে পেতে চাইছে কেন বার বার? ইরাণী চাইলেও, সে কি চাইবে?

যে মন দূর থেকে—বহুদূর থেকে ইরাণীকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছিল,

টেনে নিয়েও ছিল, সে টানার মর্যাদা দেয়নি ইরাণী।

আট বছরের ভেতর মাঝে মাঝে এসেছে প্রাণেশ। অপলক চোখে দেখেছে খানিক। কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই ফিরে গেছে নির্বিকার মুখে।

এই লোকটা ইরাণীর জ্ঞান হওয়া অবধি খুব চেনা। কিন্তু মনে হয়, এতটুকুও চিনতে পারেনি সে। বোধহয় ওর মনের গহনে ডুবুরী হতে পারনি বলে।

প্রাণেশ আশ্চর্য মানুষ।

কি করে ইরাণীর মনের কথা, ব্যথা বুঝতে পারে? যখনি ইরাণী পথহারা বিভ্রান্ত, তখনি কোথা থেকে এসে হাজির হত প্রাণেশ! সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বুকভাঙা নিশ্বাস পড়ছে। মাথার মধ্যে কি রকম করছে। বিক্ষুব্ধ চিন্তার তরঙ্গ একটার পর একটা ধাক্কা মেরে চলেছে। ইরাণী পাগল হবে নাকি শেষ পর্যন্ত!

বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। জলেডোবা রাস্তা দেখছে। ইরাণীর অতীত ডুবছে অতল জলে। বর্তমান ডুবছে, ভবিষ্যৎ ডুববে। ভবিষ্যতের ইরাণীকে কে তুলবে? তলিয়ে যাওয়া থেকে কে বাঁচাবে?

মনে হ'ল, প্রাণেশ কড়া নাড়ছে সদর দরজায়। মনকে সংযত করতে চেষ্টা করল, পারল না কিছুতেই। তরতরিয়ে নেমে গেল নিচে। ঘরের দরজার মতো সদর খুলেও নিরাশ হল। দরজা খোলা রেখেই উঠে এলো ওপরে। যদি প্রাণেশ আসে, ফিরে যাবে না।

সব দিক দিয়েই অবলম্বনহীন হয়েছে। ইরাণীর আজ প্রাণেশের জন্য হয়তো এত ব্যাকুলতা তাই! ব্যর্থ ব্যাকুলতার কোন মূল্য নেই। মনকে ঘোরানোর চেষ্টা করল। অতীতের অতৃপ্ত আবর্ত থেকে নিজেকে টেনে তুলতে পারছে না সে।

কিছুক্ষণ অতীতের দুঃখের স্মৃতি মুছে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। অতীতস্মৃতির আগুন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছিল সমস্ত শরীর। নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল স্মৃতির এক একটি চিহ্ন। রাস্তার জলে ফেলে দিতে চেয়েছিল সোনাবাঁধানো লোহা, আংটি, লকেটসুদ্ধ চেন হারটা। ফেলা হয়নি। ফেলতে পারেনি। দূর থেকে দেখেছে শুধু।

কখনো শিউরে উঠেছে, কখনো ঘৃণায়-বিদ্বেষে ভরে উঠেছে মন। কখনো আবার নিজের কাছে নিজেকে কত ছোট মনে হয়েছে। লজ্জায় মাথা নত হয়ে এসেছে।

দেরাজ আলমারী থেকে বার করে নিজেই সাজিয়েছে এক একটি উপহার ড্রেসিং টেবিলের ওপর। সোনাবাঁধানো লোহাটি প্রথম স্বামীর। আংটি দ্বিতীয় স্বামীর, আর চেন হারটা একজন পুরুষ বন্ধুর।

অমলের কাছ থেকে ফিরে আসার পরও, অমলের চিন্তা ছাড়তে চায়নি ইরাণীকে। বিশ্লেষণের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে তুলতে চেষ্টা করেছে অমলকে।

নিজের ভেতরেও কতখানি খাদ, কষে কষে দেখতে চেষ্টা করেছে বিচার-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে। নিজেকে কষতে কষতে হাঁপিয়ে উঠেছে যখন, তখনই উপহার-গুলো বার করেছিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের গহ্বর থেকে কোন অবলম্বন আঁকড়ে বেরিয়ে আসার জন্য।

বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পায়নি। কোন উপহারই অবলম্বন হতে পারে না আর। প্রথম স্বামী বন্ধন ছিন্ন করেছে। এয়োতির চিহ্ন 'লোহার' প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু জলে ফেলতে গিয়ে থমকে গেছে। চেন হারটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কথা কয়ে উঠেছে যেন।—লোহাটাকে দেখেই তো আমাকে বেশি করে বুঝতে পারছো ইরাণী! কেমন—তাই না?

হাতটা কেঁপে উঠেছে ইরাণীর।

লোহার কাছ থেকে সরে এসেছে। বুকের ধুকধুক আওয়াজটা প্রবল হয়ে উঠেছে। বুকের রক্ত মাথায়—দেহের প্রত্যেক শিরা-উপশিরায় ছুটছে দ্রুত-গতিতে।

চেন হারটার কি অমোঘ আকর্ষণ!

হারের মানুষ হাতছানি দিয়ে ডেকেছে যেন।—ইরাণী! ফিরে এসো। ভয় কি? আমি তোমার অবলম্বন। আমি তোমার—

হাত চেপে ধরেছে ইরাণী দু'কানে। না, না। অবলম্বন হতে পারে না হারের মানুষ। ইরাণী চাইলেও, সে ওকে চাইবে কেন? নিজের অনুশোচনায় আক্ষেপের কাতর আকুতিই শুনেছে মনের কানে। একটা অব্যক্ত যাতনায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়েছে।

আংটিটার দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণা বেড়েছে চতুর্গুণ। আংটিটার মালিক কি ভয়ংকর! অবলম্বন হিসেবেই তো ধরেছিল ওকে এক সময়। কি তুচ্ছতাচ্ছিল্য, কি ঘৃণা না পেয়েছে ওর কাছ থেকে।

ফেলে দিতে যাচ্ছিল আংটিটা, আগের মতো হারটা চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠল। এবার ওর মানুষ করুণার হাসি হাসছে। বলছে, যে যন্ত্রণা পেয়েছো যার কাছ থেকে, তাকে যন্ত্রণার চোখে নিয়ে দেখো না। ওর জন্যই না তুমি আমায় পেতে চাইছো? আমি অপেক্ষা করছি। আজো তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। তুমি ফিরে এসো। আমি তোমাকে গ্রহণ করবো।

ইরাণী পাগল হল নাকি? যে মানুষ এসেছে-গেছে, চেয়ে চেয়ে দেখেছে কেবল, একটা কথাও কয়নি কোনদিন, তাকে কেন্দ্র করে এসব কথা মাথার মধ্যে বেড়াচ্ছে কেন! কেন, কেন?

বিছানায় এসে আছড়ে পড়েছে। বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছে খানিক। বাইরের মেঘ কাটেনি তখনো। আকাশে আরো ঘনঘটা। মনের মেঘ কাটলো না ইরাণীর। আরো জমাট হয়ে জেঁকে বসল।

রাত আসে যায়। অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়বে

মাটির বুকে আবার। ঝড়-তুফানও চলতে পারে না অনির্দিষ্ট কালের জন্য। ইরাণী সব বোঝে সব জানে। তবু আজকের রাত বুঝি গিলতে আসছে তাকে। মনে হচ্ছে, এ রাত এ দুর্যোগ অন্তহীন। সমস্ত কিছু নিঃশেষ করেও নিশ্চিন্ত হবে না। খিদে মিটবে না। ইরাণীর ভেতর তছনছ করেও না, হৃৎপিন্ড ছিন্ন-ভিন্ন করেও না।

শুয়ে থাকতে পারছে না। চঞ্চলতা বাড়ছে। হাতের উল্টোপিঠে চোখ মুছে উঠে বসল। খোলা দরজা দিয়ে হিমশীতল দমকা বাতাস ঘরে ঢুকছে। জানলা-দরজার পাল্লার খটখট শব্দ হচ্ছে। কাঁপছে থর থর করে।

মৃত্যুর ঠাণ্ডা নিশ্বাস ইরাণীর পা থেকে মাথা অবধি ওঠানামা করছে অনবরত। প্রাণেশের মুখখানা ভেসে উঠছে শুধু চোখে। সরাতে চেষ্টা করছে, পারছে না। প্রাণেশের কাছে মুখ দেখানোর উপায় নেই তার। ক্ষমার অযোগ্য ওর কাছে। ওকে প্রত্যাখ্যানের মাশুল দিতে হয়েছে অপাত্রে জীবন বিকিয়ে দিয়ে।

অমলের জঘন্যতম আচরণে ইরাণী মর্মাহত। ভেবেছিল, আত্মঘাতী হয়ে আত্মশুদ্ধি করবে। ওর জীবনে একটা দাগ কেটে দিয়ে যাবে। যে দাগ প্রবঞ্চকের পথ থেকে তফাত করে রাখবে ওকে বরাবরের জন্য।

আত্মঘাতী হতে বাধা দিয়েছে প্রাণেশের মুখ। চেন হারের লকেটে আঁটা ফটোর মুখখানাই সচেতন করে দিয়েছে তাকে।

ত্রিবেণীসঙ্গম।

যমুনার জল আর গঙ্গার জল মিলেছে এক জায়গায়। দুটি নদী মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। যমুনা আত্মসমর্পণ করেছে গঙ্গার কাছে। এখানে সে-ও গঙ্গা হয়ে গেছে। সরস্বতী দেখা যায় না চোখে। অন্তঃসলিলা গঙ্গা-যমুনার মিলনক্ষেত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে মিশে রয়েছে নাকি সরস্বতী।

তিনটি নদীর মিলনে ত্রিবেণীসঙ্গম। এলাহাবাদের এই তীর্থক্ষেত্রটিতে অশেষ পুণ্যলাভ হয় মানুষের। পাণ্ডাদের মুখে সঙ্গমমাহাত্ম্য শুনেছিল বালু-চরের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে। প্রাণেশ আর ইরাণী।

ইরাণীর রেশম-মসৃণ কালো কুচকুচে চুল উড়ছে পশ্চিমের এলোমেলো বাতাসে। কপালের মাঝখানে টুকরো টুকরো চুল এদিক-ওদিক করছে। মুগ্ধ চোখে দেখল প্রাণেশ। কিছুক্ষণ! বলল, চুল কাটা চলবে না তোমার। একটাও না। দেহকে পীড়ন করে, সৌন্দর্য নষ্ট করে আত্মশুদ্ধি হয় না। অপরকে আত্মশুদ্ধি করানোর উদাহরণও হওয়া যায় না।

প্রাণেশের কথা কানে বেজেছে ইরাণীর। সত্যিই ইরাণী উদাহরণ হতে পারবে না অমলের কাছে। ইরাণী মরেও মরণের পথ থেকে ফেরাতে পারবে না অমলকে। অমলের চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারবে না। যে তিমিরে আছে, সেই তিমিরেই চিরদিন থাকবে ও।

আত্মঘাতী হওয়ার সাময়িক উত্তেজনা থেকে নিবৃত্ত করেছিল প্রাণেশের লকেট। তবু মৃত্যুর চিন্তা আসছে কেন ইরাণীর? কল্পনার চোখে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে কেন থেকে থেকে? কেন অনুভব করছে অঙ্গে-অঙ্গে মৃত্যুর কঠিন আলিঙ্গনের পরশ? এসব কি ইরাণীর দুঃখবিলাস।

রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে যুঝে যুঝে ক্ষতবিক্ষত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। হয়তো মৃত্যুবিলাস পেয়ে বসেছে সেইজন্য। এ সময় প্রাণেশ থাকলে তার প্রিয় উপদেশ বাণীই শোনাত।

—আত্মবিশ্লেষণ কর! নিজেকে চেনো! নিজের মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতির অনেক জঞ্জাল জমা আছে। পরিষ্কার করে ফেল! শান্তি পাবে। মান-অভিমানের জ্বালা জুড়োবে। অন্যের কাছ থেকে আঘাত পেলে, তাকে আঘাত না দিয়ে, নিজেকে সংযত রাখতে, নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করবে। যা কিছু অপরের কাছ থেকে পাও, তোমারই দেয়া জিনিস ফিরে পাও। অন্যের যে মূর্তি দেখে দুঃখ পাও, সেটা তোমারই প্রতিচ্ছবি।

মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য প্রায়ই ঘটত ইরাণীর। মতপার্থক্য চরমে উঠত এক একদিন। মা-মেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থীর। মা দক্ষিণমুখো যেতে বললে, মেয়ে উত্তরমুখো যাবে। অনেক সময় মনে হত ইরাণীর, পৃথিবীতে কেউ নেই আপনার। মায়ের সঙ্গে মতান্তর হলে বেশি করে মনে হ'ত এটা। পথে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করেছে। যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাবে।

সামনে এসে দাঁড়াত প্রাণেশ। স্নেহ ঝরে পড়ত কণ্ঠস্বরে। মৃদু হাসি লেগে থাকত ঠোঁটের কোণে। ঘনপল্লবের কাজলটানা দু'চোখ মিণ্টি-মিণ্টি হাসত। ভ্রমরকালো ভুরুর তলায় এই চোখ দুটোই ইরাণীর বুকের আগুন মাথার আগুন নিভিয়ে দিত মুহূর্তে। ' সব ভুলে যেত সে। রাগ-দ্বেষ মান-অভিমান।

প্রাণেশের মায়াবী চোখে চোখ রেখে ইরাণী সম্মোহিত হয়ে যেত। প্রাণেশের সান্ত্বনা-উপদেশ মর্মে মর্মে প্রবেশ করে, অপরিসীম আনন্দে ভরপুর করে দিত ভেতরটা। ইরাণী যেন কোন অমরালোকের অমরাবতী হয়ে যেত সেই সময়টায়।

নিজের ভেতর দেখতে পেত। অন্যের ভেতরও। কারো কোন খারাপ চোখে পড়ত না। সবার ভালো।

সেটা ক্ষণিকের জন্য ভেবে নিয়ে দেখা। প্রকৃত দেখার মতো দেখেছে সে একমাত্র প্রাণেশকেই। সত্যিকথা বলতে কি—প্রাণেশ ছাড়া আজ অবধি কারো কিছু ভালো চোখে পড়ল না তো। যতদিন কাছে কাছে ছিল প্রাণেশ, ততদিন বোধহয় ওরই চোখ দিয়ে দেখত ইরাণী, ওরই মন দিয়ে বিচার করতে সকলকে। তাই শান্তি পেত একটু। এখন অশান্তির আগুনে পুড়ে ছারখার হ'তে বসেছে।

প্রাণেশকে দূরে ঠেলে দেয়ার পরই জীবন-যন্ত্রণার শুরু। এ যন্ত্রণার কি শেষ হবে না কোনদিন? আকাশ বাতাস রাত্তির সেদিনও এই রকম ছিল। এই রকম বর্ষণমুখর রাতে এসেছিল প্রাণেশ।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ইরাণী শুয়ে আছে। চোখ বুজে। ঘুম আসছে না। ঘুমোতে ইচ্ছেও করছে না। ঘুমের চিন্তা করতে ভালো লাগছে। চিন্তার ভেতর সুখ-স্বপ্ন দেখতে মন চাইছে।

ইরাণী বর্ষারাতে ভিজে গেছে। শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে বীরেন। বলেছে, হ্যারি আপ! উঠে পড় ডার্লিং। একি, জামা-শাড়ি ভিজে সপসপে যে! এই মরেছে, গলাটা না বসিয়ে ছাড়বে না দেখছি। খেয়াল আছে তো কাল ফাংশান, গাইতে হবে।

উঠে বসল ইরাণী।

আদুরে সুরে বলল, ডিরেক্টর সাহেব, আমার গলার জন্যেই আসা তাহলে, আমার জন্যে নয়?

গলা ছাড়া কি তুমি, না তুমি ছাড়া গলা? কাছে এসে বলল বীরেন।

পাপিয়াকণ্ঠী ইরাণীর সুরেলা কণ্ঠ গেয়ে চলেছে কাজী সাহেবের গান—'গুল-বাগিচার বুলবুলি আমি, রঙিন প্রেমের গাই গজল···'

বীরেন তন্ময় হয়ে শুনছে। মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছে।

গান শেষ হ'তে বলল, ইরাণী, তোমার চোখ কত সুন্দর—তুমি নিজেও জান না। ওই চোখের তারা কি যাদু জানে। টানে, বারে বারে টেনে নিয়ে আসে এখানে। আসবো না ভাবলেও। বাড়ির কেউ আসতে দেয় না। তারা চায় না তোমাকে। আমাকে আটকায়। কিন্তু আটকালে কি আটকানো যায়? কারো মনকে বেঁধে রাখতে পারে কি কেউ—ইচ্ছে করে বাঁধা না পড়লে?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল বীরেন, থাকতে পারি নে কারো কাছে। তোমার চোখ আমার মোটরের স্পিড বাড়াতে থাকে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চলে আসি।

প্রথমে মনে হয়েছিল, বীরেনের স্তুতি স্রেফ। কিন্তু এ স্তুতি বড্ড ভালো লাগছে ইরাণীর। শুনতে শুনতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সত্যি মনে হচ্ছে! মনে হচ্ছে, ওর অন্তরের কথা! নির্ভেজাল খাদশূন্য।

ভুলে যাচ্ছে দুনিয়া। ভুলে যাচ্ছে প্রাণেশকে। আর চারদিন বাদে ফিল্ম-জগতের ডিরেক্টর বীরেন ঘোষের ঘরণী হবে ইরাণী। কাগজে-পত্রিকায় বীরেন ঘোষের সঙ্গে ইরাণীর ছবি ছেপে বেরুবে। বেরুবে জীবনী।

নিজের মনেই হাসল ইরাণী।

মা পত্র-পত্রিকা দেখে চমকে উঠবে। মায়ের ভুল—কি মেয়ের? ভালো করে বুঝতে পারবে। আত্মগর্বী মাকে হার মানতে হবে মেয়ের কাছে।

প্রাণেশ কি করবে, কি ভাববে ছবি দেখে? বেচারা হা-হুতোশ করবে। এ ছাড়া ওর আর অন্য পথই বা কি আছে? বড্ড কল্পনাপ্রিয় প্রাণেশ। কল্পনার রাজ্যে প্রাসাদ গড়ে তোলার কোন মূল্যে নেই, বুঝবে এবার। ইরাণীকে নিয়ে নতুন সমাজের ভিত পত্তন করার আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে নিমেষে।

সুখের ভাবনায় ছেদ পড়ল ইরাণীর প্রাণেশের মুখ ভেসে উঠতে। মায়ের পরাজয়ে খুশী সে। কিন্তু প্রাণেশের পরাজয়ে শুধু অসুখীই হবে না, নিজের মনের কাছেও পরাজিত হবে।

এ লোকটা যেন কেমন। ইরাণীর কোন কথা বোঝেনি। বুঝল না আজ অবধি। লোকটা কেন এত চুপচাপ? কেন তাকে ভর্ৎসনা করে না? কেন তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল না?

প্রাণেশকে আঘাত দিতে ইচ্ছে করেছে ইরাণীর মাঝে মাঝে। জ্বালাতে ইচ্ছে করেছে। মানুষটা নেমে আসুক বাস্তবে। বিফল হয়েছে তার সমস্ত প্রয়াস। মনোমত কবে তুলতে পারেনি। তবুও কেন জানে না, ভুলতে পারেনি—ছাড়তে পারেনি ওকে।

হঠাৎ চমকে উঠল ইরাণী।

ঘরের ভেতর বাজ পড়ার আওয়াজ শুনল। অন্ধকার হয়ে গেছে ঘরখানা। ধাক্কা লেগে টেবিল থেকে ল্যাম্পটা পড়ে গেছে মেঝেয়। বাল্ব ভেঙেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জানলার সার্সীর কাঁচে আলোর ঝলক ঠোক্কর খেয়ে ঠিকরে পড়ছে ঘরের কোণে।

দেখছে ইরাণী। টেবিলের ধার ঘেঁষে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কে? ডিরেক্টর সাহেব?

না।

প্রাণেশ। ইরাণী উঠে পড়ল শয্যা ছেড়ে। প্রাণেশের গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখল। নিওনলাইটটা জেলে দিল তাড়াতাড়ি। বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। কেন ভাবছিল প্রাণেশের কথা?

ভাবলেই ও আসে!, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। চিন্তার তলকুল পায় না।

জনমানবশূন্য রাস্তা। জলে জলময়। গাড়িঘোড়া বন্ধ। এলো কি করে মানুষটা! চিন্তা করলে আসে, জেনেশুনেও এ নিরীহ লোককে কেন কষ্ট দেয় চিন্তা করে?

বোসো প্রাণেশ। কাপড়-জামা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে একেবারে। ছেড়ে ফেললে হত না?

দরকার নেই।

বোসো!

না। চলে যাবো এক্ষুনি। একটা কথার ঠিক উত্তর দেবে আমাকে? অবিশ্যি যদি আপত্তি না থাকে।

কোনদিন কোন কথা তো গোপন করিনি তোমার কাছে।

মাসীমার কাছে যা শুনলুম, চারদিন বাদে—

হ্যাঁ প্রাণেশ, বীরেন ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে আমার।

পারো তো তোমার মত পরিবর্তন করো। আমার মনে হচ্ছে, ভুল পথে

পা বাড়াচ্ছে ইরাণী। আগেও বলেছিলুম, এখনো বলছি।

জেদী মেয়ে ইরাণী ; তার জেদের ওপর কারো হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করেনি কখনো। করবেও না। সমস্ত মায়ের কারসাজি। প্রাণেশকে হাতিয়ার করেছে। বৃষ্টি-বাদলেও পাঠিয়েছে ওকে। ভেবেছে, সহানুভূতি আসবে ওর ওপর। মা জানে, ওর কথার বেশি কথা কইতে পারে না সে। কেমন যেন দুর্বলতা আছে। সেই সুযোগ নিতে চাইছে মা। মায়ের আশা পূর্ণ করতে দেবে না কিছুতেই ইরাণী।

মেয়ে সুখী হোক—মর্যাদা পাক সকলের কাছে, মোটে চায় না মা। মায়ের বিয়ে বন্ধের যুক্তির কোন যথার্থ ভিত্তি নেই। মায়ের অন্যায় গোঁ-ই এ বিয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে বেশি করে। এগিয়ে দিয়েছে তাড়াতাড়ি।

সবচেয়ে বেশি অবাক হচ্ছে ইরাণী প্রাণেশের ব্যবহারে। প্রাণেশও মায়ের দলে। ইরাণীর সুখ-সুবিধের দিকে একদম লক্ষ্য নাই। স্বার্থপর হয়ে উঠেছে ভয়ানক। নতুন সমাজ তৈরীর একটা ভুল ধারণা নিয়ে লোক ঠকানোর ফিকির আঁটছে। বুঝিয়ে বুঝিয়ে তাকেও ফাঁদে ফেলার যে চেষ্টা হয়নি, তা নয়। হয়েছিল। ভাবগতিক দেখেই তো ঠাহর করতে পারা যাচ্ছে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলে, বেঁচে গেছে। যোগাযোগ হয়ে গেছে ফিল্ম-ডিরেক্টর বীরেন ঘোষের সঙ্গে।

বৃষ্টিতে এত ভিজেও, গাত্রদাহ একটুও কমেনি প্রাণেশের। বীরেনের সঙ্গে বিয়েটা সইতে পারবে না। কথার ধরনেই প্রকাশ পেয়েছে।

সুখের পথে কোন কণ্টক রাখবে না ইরাণী। নির্মূল করে ফেলবে চিরদিনের মতো। মাথার মধ্যে উষ্ণ রক্তের স্রোত বইছে। প্রাণেশকে দেখলে শ্রদ্ধা আসত। ওর দু'চোখ খোদাই হয়ে গেছল অন্তরে। মুছে যাচ্ছে। ঘৃণা আসছে।

আমার এখানে এসো না তুমি। আর কোনদিন কোন সময় দ্বিতীয়বার যেন দেখা-সাক্ষাৎ না হয় তোমার সঙ্গে। যা ভালো বুঝছি, করছি। যা ভালো বুঝবো, করেও যাবো তাই। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো ইণ্টারফিয়ার পছন্দ করি না।

প্রাণেশের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে। ইরাণীর লক্ষ্য পড়ল না এ চোখ।

এখনো দাঁড়িয়ে কেন? মুখ দেখতে চাই নে। বেরিয়ে যাও! এখুনি বীরেন ঘোষ এসে পড়বে। দেখলে, বলবে কি! রাগে ফুলছে ইরাণী।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে প্রাণেশ।

ইরাণীর রাগ কমেছে। ভয় ধরেছে। ভবিষ্যতের সুখসৌধ ভেঙে চুরমার হয় বুঝি। প্রাণেশের বদ মতলব। অপমান করা সত্ত্বেও এক পা নড়ছে না। বীরেন ঘোষ এলে, অনর্থ করে বসবে হয়তো। একটা বোবাকান্না ডুকরে উঠছে ভেতরে।

কোনদিন কোন অনিষ্ট তো করিনি তোমার, তবে আমার সৌভাগ্যকে তছনছ করতে এসছো কেন ?

আচমকা প্রাণেশ প্রবল ধাক্কা খেল। এক একটা পাঁজরা গুঁড়ো হয়ে গেল যেন ইরাণীর মোক্ষম আঘাতে। আমার সৌভাগ্যকে···। আর এক মুহূর্তও দাঁড়ানো উচিত নয়। ভুল বুঝল ইরাণী। ইরাণীর সৌভাগ্য নষ্ট করার কোন চিন্তাই আসেনি প্রাণেশের। স্বপ্নেও না।

মুষলধারে বৃষ্টি নামল আবার।

ম্লান-মৌন মুখে প্রাণেশ ফিরে গেল।

যাক, আপদকে বিদায় করতে পেরেছে বীরেন আসার আগেই। সুরবালাকে ডেকে শাসনের ভঙ্গিতে বলল, জানি, তুই এসব ব্যাপার ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবি নে বীরেনবাবুর কাছে। তবুও সাবধান করে দেয়া উচিত আবার। প্রাণেশ যে এসেছিল, টের যেন না পায় মোটে। বুঝলি ?

ঘাড় নাড়ল সুরবালা, বুঝেছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, তিন পুরুষ কাজ করে আসছে তারা ইরাণীদিদের বাড়িতে। কত কাণ্ডই না দেখেছে, একটা কথাও কি মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছে কোনদিন ? বলা হল না। ইরাণীদের মুখখানা ভীষণ থমথমে। আকাশের কালো মেঘের সবটাই নেমেছে মুখে। মেজাজ চড়াসুরে বাঁধা এখন।

ঘুম ভাঙার পর থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত ইরাণীদির কত রকমই না ভাবের উদয় হয়, বোঝা দুষ্কর। কখনো গরম, কখনো নরম। কখনো একলা বসে বসে হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসাচ্ছে। কখনো আবার খুশীতে নেচে বেড়াচ্ছে গোটা বাড়ি ঘুরে।

সুরবালাকে জড়িয়ে ধরে, চুমু খেয়ে, সে কি আদর ! বেশি আদর সওয়া সুরবালার ভাগ্যে লেখা নেই নাকি ! তাই আদরের পরই আবার বরাতের পাওনা চড়চাপড়টা পেতে এতটুকু দেরী হয় না।

দুখের পর সুখ, সুখের পর দুখ। চড়চাপড় খেলে, শাড়ি-ব্লাউজ—কিছু না কিছু লাভ যোগ হবেই সুরবালার। মা-দিদিমা কানে যে মন্ত্র দিয়েছে—পেটে খেলে পিঠে সয়। সুরবালা জপ করে চলেছে অহর্নিশি। যতদিন ঝিয়ের কাজে লেগেছে এ বাড়িতে। অবিশ্যি গুরুজনের উপদেশ মাথায় রেখে, দিন মন্দ কাটছে না তার।

দুঃখ হয় প্রাণেশবাবুর জন্য। প্রাণেশবাবু যখুনি এসেছেন, আড়াল থেকে লক্ষ্য করেছে। সামনে আসেনি ভয়ে। কার সঙ্গে ইরাণীদির কি হচ্ছে না হচ্ছে সুরবালা মাথা না ঘামায় যেন, না ডাকা অবধি কাছে যেন না আসে। কড়া হুকুম। তামিল করে যাচ্ছে বাঁদী। রাতেদিনে অনেক ছবিই দেখছে ঘুমের ভান করে। ইরাণীদিকে—সিনেমায় গিয়ে—ছবিতে আর দেখতে হয় না।

সুরবালা চলে যাওয়ার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। সোফায় বসল ইরাণী।

উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে, দু'চোখে হাত চাপা দিল।

ইরাণীদি বিচিত্র মানুষ। প্রাণেশবাবুকে তাড়িয়ে দিয়ে কাঁদতে বসল এবার।

চোখ থেকে হাত নামাল ইরাণী। সুরবালা যা ভেবেছিল, ভুল। কাঁদেনি মোটে। মরুভূমির মতো শুকনো খটখটে চোখ। জলের লেশমাত্র নেই। আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

সুর, বীরেনবাবু কি এসেছিল? তীব্রতীক্ষ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন ইরাণীর।

সুরবালা হতভম্ব, হতবাক।

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলি যে?

দেখিনি তো।

কুম্ভকর্ণের ঘুম তো চোখে লেগেই আছে। দেখবি কোত্থেকে! যদি বীরেন এসে ফিরে যায়, সব কথা শুনে থাকে পেছন থেকে, সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। আমার কেউ হল না। ভাগ্য। কেউ সুখ চায় না আমার। ঘর বাঁধতে চেয়েছি বলে, মস্ত বড় অপরাধী হয়ে পড়েছি আমি সকলের চোখে। এই দুনিয়া, এই দুনিয়ার লোক!

হাসি চেপে রাখতে পারছে না আর সুরবালা। একেই বলে, সুখে থাকতে ভূতে কিলোনো। ইরাণীদি ইচ্ছে করেই এক একটা কষ্ট তৈরি করে। কোনদিন নিজে শান্তি পাবে না, কাউকে শান্তি পেতেও দেবে না।

হাসি চাপতে সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে সুরবালার। চোখে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মাথা নিচু করে রইল হাসি ঢাকার জন্য।

মরণ আর কি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্না হচ্ছে আবার! আমায় সান্ত্বনা দেয়ার কেউ নেই। বোঝানোর কেউ নেই। আমিই সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে গেলুম, বুঝিয়ে গেলুম।

সুরবালার কাঁপুনিটা বাড়ল আরো। বেসামাল না হয়ে পড়ে শেষে। পালাতে পারলে বাঁচে।

এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমার ভালো লাগছে না আর তোদের কাউকে। চলে যা চোখের সুমুখ থেকে। বেরিয়ে যা শিগগির! শিগগির—

সারারাত চোখে-পাতায় এক করতে পারেনি একটুও ইরাণী। যদি ঘুমিয়ে পড়লে বীরেন এসে ফিরে যায়। কষ্ট করে এসে, ইরাণীর ঘুম ভাঙলে কষ্ট হবে বলে যদি না ঘুম ভাঙায়।

আশা করেছিল, ভোরে আসবে নিশ্চয়। এলো না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা বাড়তে লাগল। দ্বিধা-সংশয় গ্রাস করে ফেলতে লাগল গোটা মনকে।

রিসিভার তুলে নিল। কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি? বুকটা খালি হয়ে গেল খবর শুনে। রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে হত। বীরেনের কোন দোষ নেই, দোষ ইরাণীর নিজের।

বলেছিল বীরেন, তৃষ্ণা! অশুভ কাজে বিলম্ব করা ভালো। শুভ কাজে একটুও দেরী করা উচিত নয় কিন্তু। শুভস্য শীঘ্রম, অশুভস্য কালহরণম্।

ইরাণী বলেছে, তোমার ইরাণীকে তৃষ্ণা নাম দিয়েছো, তৃষ্ণাটা কতদিন থাকে, দেখাই যাক না! মন যেখানে হারিয়ে যায় মনে, সেখানে সামাজিক বন্ধনটাই কি সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে?

না।

তবে?

তবে কি জানো, মনের দশ মাথা।

হেসে লুটিয়ে পড়ল ইরাণী—রাবণের দশ মাথার কথাটাই তো শুনেছি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে। ডার্লিং, আজ নতুন কথা শুনলুম তোমার মুখে।

মনও রাবণ। মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়। রাবণের দশ মাথা স্রেফ সিম্বল। কারো হয় নাকি ওরকম? আসল ব্যাপার দশটা ব্রেনের সমান রাবণের ব্রেন। দশ রকম ভাবে বুদ্ধি খেলে যায় একই সময়ে। মন কখন কি করে বসে, মনের মালিকরাও জানতে পারে না। আমার ভয় করে তৃষ্ণা।

ইরাণী হাসছে। হাসিতে টানছে লোকটাকে। যাচাই করে দেখছে, সত্যি কব্জায় এসেছে, না অভিনয় করছে বীরেন তার সঙ্গে। বীরেন অভিনয় শেখায়, ইরাণী অভিনয় করে।

মায়ের কথা অমান্য করা স্বভাব ইরাণীর। কিন্তু একটা কথা মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে আছে। মুছে ফেলার চেণ্টা করেছে অনেক—অনেক দিন। বরং ভুলতে গিয়ে আরো লক্ষ্য পড়েছে। ফলে কথাটা কারণে-অকারণে খোঁচা দেয়। খোঁচা দিচ্ছে।

ইরাণী দেখছে বীরেনের দু'চোখ। চাউনির মধ্যে কোন খাদ আছে কিনা। মনে পড়ছে মায়ের কথা। অভিনেত্রী শিক্ষকের শিকার হতে চলেছে, না শিক্ষক অভিনেত্রীর?

মায়ের কথা ত্যাগ করতে না পারলেও, শিকারের চোখে বীরেনকে দেখতে মন চায় না ইরাণীর। মমতা আসে। অন্তর দিলে অন্তর মেলে, প্রবাদ হলেও, এই সিদ্ধান্তের ওপর গভীর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস আছে তার। শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের জোরেই ইরাণী নিজের করে নিতে চায় বীরেনকে।

তৃষ্ণা! হাসতে হাসতে এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

ইরাণী সংবিৎ ফিরে পেয়েছে। বীরেনের স্পর্শ মধুর লেগেছে। ইরাণীর চিবুক ধরে আদর করে বলেছে বীরেন, আমার ভয় করে শুনে, হঠাৎ এত অন্য-মনস্ক হয়ে গেলে কেন তৃষ্ণা? কিসের এমন ভয় হল তোমার?

ভয় কোথায় ডার্লিং? এই তোমার অভয়-হাত ধরে রয়েছি!

তুমি তো জানো, বুলু-এনাকেও অভয় দিয়েছিলুম। আমার অভয়ের কোন ইজ্জত রেখেছে ওরা? রাখেনি। বুলু ভেসেছে নির্মলকে নিয়ে। আর এনা

সে আমার অ্যাসিসটেন্টকে নিয়ে আমার গ্রুপ থেকে বেরিয়েই গেল একেবারে। ওদের দাঁড় করানোর জন্য কি না করেছি। বন্ধুমহলে রটে গেল বীরেন দ্বিতীয় ষষ্ঠ জর্জ। সিম্‌সনদের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে রাজী। বিষয়-আশয়— এমন কি মানসম্ভ্রম পর্যন্ত! এ উদারতার তুলনা নেই ত্রিভুবনে।

বীরেনের ব্যথার নিঃশ্বাস ঝরেছে বাতাসে। ছোঁয়া লেগেছে ইরাণীর সর্বাঙ্গে। কাতর হয়ে পড়েছে ইরাণী।

অকৃতজ্ঞ নই আমি। আমার অবস্থা তো সব জানো! কি যুদ্ধ করে চলেছি তোমার জন্য। এটুকু অ্যাসিউরেন্স দিতে পারি—আমি কখনো বুলু-এনা হব না।

আবেগে ইরাণীর ডান হাতখানা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরেছে বীরেন! কখনো যেন পালিয়ে যেতে না পারে তার কাছ থেকে। ইরাণী সেদিন নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিল। দুটি হৃদয় একটি হৃদয় মনে হয়েছিল। আর সেটি বীরেনের একার কেবল।

রিসিভারটা তখনো ধরা আছে হাতে। নামানো হয়নি। ঘাড়ের কাছে একটা উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শ পেল ইরাণী। সচেতন হয়ে উঠল। বীরেন পেছনে দাঁড়িয়ে।

অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠল ইরাণীর মন। চোখের কোণ চক চক করছে। হারানো প্রিয়জনকে ফিরে পেয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখছে প্রাণভরে।

মাথা নীচু করল বীরেন।

অপরাধী মুখ করে বলল, স্টুডিওতে আটকে পড়েছিলুম। তোমায় কষ্ট দিলুম খুব। ফোন করে লাইন পেলুম না। দেহ আমার ওখানে থাকলেও মন ছিল তোমার কাছে। কি—উত্তর দিচ্ছ না? বিশ্বাস হচ্ছে না?

হচ্ছে। ভেজা গলা ইরাণীর।

কাঁদছো কেন? আমার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইছি।

ছিঃ ছিঃ! ও কথা মুখে এনো না!

ইরাণী হাত চেপে ধরল বীরেনের মুখে। অপরাধী আমি তোমার কাছে বীরেন। তুমি নও।

ইরাণীর হাতটা আলতোভাবে সরিয়ে দিয়ে বীরেন বলল, কিসে অপরাধী তৃষ্ণা? বারবার এ কথা বলে দুঃখ দাও কেন? আমার কাছে কোন অপরাধ করনি। বল, একথা আর কোনদিন বলবে না?

মুখে না বললেও মনের ভাষা বন্ধ করবো কেমন করে ডার্লিং? তোমাকে এক রাত না দেখে কি যাতনা যে ভোগ করেছি, বুঝিয়ে বলতে পারবো না। মনে হয়েছে কত—কতদিন দেখিনি। ছ'মাসের আলাপে যদি আমার এই অবস্থা তাহলে বাড়ি না ফিরলে, তোমার মা-বাবার কি অবস্থা হয় বল তো? তোমার

মা-বাবা আত্মীয়-স্বজনের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে চাই নে তোমায় ডার্লিং!

ভুল ভাবছো তৃষ্ণা। বাড়ির কেউ আমায় সুখশান্তি চায় না, আমায় বোঝে না। তুমি ওদের মতো হয়ো না যেন। তোমাকে পেয়ে আমি ওদের দুর্ব্যবহারের কথা, বুলু-এনার বিশ্বাসঘাতকতার ব্যথা—সব ভুলেছি। তুমি ভুল বুঝলে, বাঁচতে পারবো না আমি তৃষ্ণা। তোমার মন পরিবর্তন হচ্ছে, চিন্তা করে দ্যাখো। সেদিন বলেছিলুম না, মুহূর্তে মুহূর্তে মন বদলায়? মনের দশ মাথা। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলে। আর দেরী করে লাভ নেই।

ভুল যেন কোনদিন বুঝতে না হয় তোমাকে বীরেন। ভুল বোঝার আগে যেন মৃত্যু হয় আমার। তোমায় ভুল বুঝলে, আমার চেয়ে আঘাতটা লাগবে বেশি তোমারই। সে আমি সইতে পারবো না একদম।

একটা কথা শুনবে?

বল।

বহুবার বলেছি, তবু আবার বলছি। বলার আগে কিন্তু একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তোমায়। রাজী?

সম্ভব হলে।

সম্ভব-অসম্ভবের কথা নয়। জীবন-মরণের প্রশ্ন। আমার ভালোর জন্য, আমার শান্তির জন্য মরতে পারবে তুমি?

ইরাণীর ভেতর হাসছে, বাইরে মুখে শোকের ছায়া নেমেছে। ইরাণী চায় না বীরেনের মৃত্যু। বীরেনকে বাঁচানোর জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতে একটু দ্বিধা করবে না। সে এই জাতের মেয়ে। এই জাতের স্বামী-সোহাগিনীদের অনেক কাহিনী শুনিয়েছে বীরেনকে।

রাজপুতানার বীরাঙ্গনাদের কথা শোনাতে শোনাতে আনন্দ-বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ত। বীরেন শুনত তন্ময় হয়ে। পদ্মিনী জহরব্রত করেছিলেন। আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তাঁর রূপের আগুন নিশ্চিহ্ন করার জন্য। মেবারের রাজপুরবাসিনী পদ্মিনীর এই আত্মাহুতি আল্লাউদ্দীনের রূপলিপ্সাকে খর্ব করেছিল, পরাজিত করেছিল।

কই, উত্তর দিলে না তো? চুপ করে রইলে কেন? মরতে পারবে কি না, এটার জবাবও 'সম্ভব হলে'? অধৈর্য কণ্ঠস্বর বীরেনের।

নিমেষে ইরাণীর মুখ থেকে শোকের ছায়া সরে গেল। ভেতরের হাসি বেরিয়ে এলো বাইরে। চোখে-মুখে হাসির ঢল নামছে।

ইরাণী যেন পতিপ্রাণা পদ্মিনীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। ভাবী পতির জন্য প্রাণ দিতে কোন কুণ্ঠা করবে না কখনো।

রাজী। মরতে প্রস্তুত।

রাজী! আনন্দের উন্মাদনায় পাঁজাকোলা করে ইরাণীকে তুলে নিল বীরেন। বিছানায় এনে শুইয়ে দিল।

ইরাণী হেসে কুটিকুটি। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল বীরেন। আর কোন সময় নেয়ানিয়ি নয়। সব ঠিক করাই তো রয়েছে। আজই রেজিস্ট্রি করে ফেলতে হবে।

ইরাণী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।—তোমার ইচ্ছেয় বাধা দেবার ক্ষমতা নেই আমার।

দেশে দেশে ঘুরে মধুযামিনী যাপন করেছে ইরাণী-বীরেন। প্রতিদিন রাতে ইরাণী নতুন করে আত্মপ্রকাশ করেছে বীরেনের কাছে। পুরুষের মন এক-ঘেয়েমি ভালোবাসে না। নিত্যনতুনে ডুবে যেতে চায়। নতুনের মোহ আছে, নতুন আকর্ষণ বাড়ায়। বীরেন তৃষ্ণা নাম দিয়েছে। সে নামের মর্যাদা ইরাণী রেখেছে।

রাতের ইরাণীকে দেখে, বীরেন প্রার্থনা করেছে রাত্রির কাছে—তুমি যেও না! ইরাণীর এ রূপকে ধরে রাখো! অনুরোধ! ভোর হওয়ার মুখে দু'-চোখে হাত চাপা দিয়ে বলেছে, ভোরের মুখ দেখতে চাই নে আমি।

ইরাণী হাত সরিয়ে দিয়েছে চোখ থেকে। সজল চোখে ইরাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে বীরেন। অভয় চেয়েছে যেন। দু'চোখের ভাষা ইরাণী বুঝেছে। বীরেনকে নির্ভয় করেছে।—আমি কোনদিন হারাবো না তোমার কাছ থেকে। কালকের মধুর রাত মধুর হয়ে উঠবে আরো আজকের চেয়ে।

বাইরে বেড়ানোর সঙ্গে ছবির সুটিং চলেছে। বীরেনের পরিচালনায় নায়িকা ইরাণীও অপূর্ব অভিনয় করেছে প্রত্যেক ছবিতে। ছবি তোলার সময় অভিনয় দেখে, কখনো কেঁদেছে, কখনো হেসেছে বীরেন। বলেছে, ইরাণী, তোমার তুলনা তুমিই। তুমি গ্রেটাগার্বোর মতো ভাবসম্রাজ্ঞী।

মাস তিনেক পরে, মধুযামিনী শেষে ফিরে এসেছে নবদম্পতি। বিজ্ঞাপনের ছবি ছেয়ে গেছে সারা কলকাতাময়। ইরাণীর ছবি লোকের মানসপটে ছেপে গেছে। নাম মুখে মুখে ঘুরছে।

ছবির মুক্তি হতে দেখা গেছে, ইরাণীর ছবি 'হাউসফুল'।

অল্প সময়ের মধ্যে ইরাণী ছায়াজগতের মক্ষীরানী হয়ে উঠল।

ইরাণীর প্রার্থনা ঈশ্বর স্বকর্ণে শুনেছিলেন বুঝি। তাই যশ প্রতিষ্ঠা অর্থ ঢেলে দিয়েছেন ওকে। এসব দেখে সইতে পারেনি তার ভবিতব্য—যদিও ঈশ্বর সৃষ্টি ভবিতব্য—বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল—অলক্ষ্য থেকে হেসেছিল। নির্মম পরিহাস করার জন্য তৈরী হচ্ছিল। হতভাগিনী ইরাণী বুঝতে পারেনি এত-টুকু।

উন্নতির উঁচু শিখরে উঠেছে যত, ততই শ্রদ্ধা জেগেছে বীরেনের সোনা-বাঁধানো লোহাটার ওপর।

এই লোহাটা রেজেস্ট্রি হওয়ার পর ইরাণীর বাঁ হাতে পরিয়ে দিয়েছিল

বীরেন। বলেছিল, এটা খুলো না, হারিও না কখনো। হারালে, খুলে রাখলে, আমায় হারাবে কিন্তু।

কথা শুনে, শিউরে উঠেছে ইরাণী। কানে হাত চাপা দিয়েছে। অভিমানের সুরে বলেছে, এরকম অলক্ষুণে কথা বলো না আর।

অলক্ষুণে কাণ্ডই ঘটে গেল একদিন হঠাৎ। ইরাণীর মেজাজ চড়া ছিল সকাল থেকে। কদিন ধরে মতান্তর চলেছে বীরেনের সঙ্গে। বীরেনও যেন কেমন পাল্টে গেছে।

চার বছর আগেই—বিয়ের সময়ের বীরেন আর এ বীরেন আকাশ-জমিন ফারাক। এখন স্ত্রী আর সৌন্দর্যের রানী প্রেমিকা নয়, ক্রীতদাসী। হুকুম শুনতে বাধ্য।

বীরেন সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছে। বীরেন পাঁক থেকে তুলেছে। ইরাণীর সম্মান রাখার অধিকার বীরেনের নিশ্চয় থাকবে। ইরাণীর কোন কথা কওয়া চলবে না বীরেনের কথার ওপর—মতের ওপর।

ইরাণী মেনে নিয়ে ছিল সমস্ত কিছু। কিন্তু প্রযোজক অর্থদাতা ছাড়াও অনেকের সঙ্গে রাতের শয্যাসঙ্গিনী হতে ঘোরতর আপত্তি করত। এই আপত্তি চরমে উঠল। শেষ অবধি দুজনের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। পরে বিচ্ছেদে পরিণতি। অবিশ্যি দুজনের সম্মতিতে।

বীরেনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার পর সামনে এসে, পথ আগলে দাঁড়াল অমল।

অমল সুদর্শন অভিনেতা।

অমলের সঙ্গে ইরাণীর যোগাযোগটা অঘটন ঘটার ব্যাপারের মতো। বীরেনের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ছায়া জগৎ থেকে ইরাণী সরে গেছল। একটা প্রচণ্ড আঘাতে জর্জর হয়ে অভিনেত্রী-জীবনে ধিক্কার এসে গেছল। প্রেমের অভিনয় করে নিজে অন্যের আসল প্রেমকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল।

সে প্রয়াস নস্যাৎ হয়ে গেল।

ইরাণী বুঝেছে নকল নকলকেই টানে। আসলকে নয়। নকলের মুখোশ খুলে ফেলেছিল তাই বিয়ের পর। বীরেনকে নিয়ে স্থায়ী ঘর বাঁধতে চেয়েছিল সত্যিসত্যি। কিন্তু বীরেন তার অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে মিশেছিল বলে ইরাণীকে ঠিক মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। বড় অভিনেতার তারিফ করার মতো সুন্দর অভিনয় করে গেছে তার সঙ্গে।

এক সময় হাসতে হাসতে বলে ফেলেছিল বীরেন মনের কথা। —তুমি কবির উর্বশী। বধূ মাতা-কন্যা নও। তুমি সকলের। তোমার রূপে সবার তৃষ্ণা বাড়ায়। সেই জন্য তোমার নাম রেখেছি—তৃষ্ণা। তোমায় একা আমার করে ধরে রাখা মহাপাপ। ভগবানের ওপর কলম চালানো। রূপসী ইরাণী, তুমি রূপপিপাসুদের পিপাসা মেটানোর জন্যেই এসেছো।

প্রথমে বীরেনের কথা রহস্যের ফুলঝুরি ভেবে নিয়েছিল ইরাণী। গুরুত্ব

দেয়নি অত। পরের কথা শুনে, গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছিল।—তোমার রূপের সদ্ব্যবহার করার জন্যই তোমায় বিয়ে করা। তামাশা নয়, সত্যিই বলছি।

ইরাণীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল। বিয়ের পরেও রূপের বেসাতি!

বন্ধু বেলা এসে অনেক বুঝিয়েছে সিনেমা ছাড়ার পর। অন্তত মঞ্চে অভিনয় করার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছে। প্রথমে রাজী হয়নি। বলেছিল, রূপের বেসাতি করতে আর ভালো লাগে না। কারো তৃষ্ণা বাড়াতে পারবো না আর।

বেলা হেসেছে।—দরকার নেই। রূপ ঢেকে দেবো মেকআপ করে। না হয় আলিবাবার আবদাল্লাই সাজবি তুই। একজন বক্স না পেলে যে একেবারে ডুববো রে! তোর তো লোকের ওপর দয়ামায়া আছে। দানধ্যানও তো করিস অনেক। আমাদের একটু বাঁচা ভাই।

গররাজী হয়েও কথা এড়াতে পারেনি ইরাণী। বেলার কথামতো অন্য নাটুকে দলের হয়ে মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে—মঞ্চে অভিনয় করেছে।

'নীলমাটি' অভিনয়ের জন্য একজন ভালো অভিনেতার খোঁজে ইরাণীর কাছে আবার এলো বেলা। যদি জানাশোনা থাকে কেউ, কম টাকায়—বক্স আছে এমন অভিনেতাও পাওয়া যেতে পারে।

পাওয়া গেল মনোমত অভিনেতা। ইরাণীর সাহায্যপুষ্ট পলাশকুমার। পলাশকুমারের রূপ আছে যে শুধু তাই নয়, গানের সুমিষ্ট গলাও আছে। পলাশকুমারের উচ্ছৃংখল জীবনের পরিবর্তন করেছিল ইর়াণী। মৃত্যুশয্যায় শয়ান তখন পলাশকুমার। দেখতে এসেছিল ইরাণী।

অবাক হয়েছিল সংসারের দৈন্যদশা দেখে। হাঁড়িতে চাল নেই, রুগীর ওষুধ-পথ্য নেই। স্ত্রী-পুত্র কাঁদছে বসে দাওয়ায়। নেশার বন্ধু ছিল যারা, আজ কেউ পাশে নেই। নেশার খেসারত দিয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে শরীর ক্ষয় করে মানুষটা। সংসারের ভার নিয়েছিল ইরাণী, রুগীরও।

ভালো হয়েছে পলাশকুমার ইরাণীর প্রাণপণ চেষ্টায়। পলাশকুমার কৃতজ্ঞ ইরাণীর কাছে। অনুগতও।

ইরাণীর প্রভাবে মঞ্চে-মঞ্চে অভিনয় করতে শুরু করেছে পলাশকুমার। পূর্ব-গৌরব ফিরে পাচ্ছে ধীরে ধীরে।

এহেন অভিনেতাকে অভিনয়ের রিহার্সেল দেয়াতে গিয়েই দেখা হয়েছিল অমলের সঙ্গে ইরাণীর।

স্টেজ রিহার্সেল চলছে তখন।

পলাশকুমারকে নিয়ে ইরাণী স্টেজে প্রবেশ করতেই অমলের সঙ্গে চোখাচোখি হল। বিরক্তিতে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল অমল! তার মুখের ভাত কেড়ে নিল নিজের লোককে এনে ইরাণীদেবী। স্টেজ থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে!

ইরাণী খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে সমস্ত। লোকটা কেমন অস্বাভাবিক যেন।

একটা ভদ্রতাও থাকে মানুষের। শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় হওয়ার আগে চলে যাওয়াটা বিসদৃশ ঠেকেছে চোখে। শিল্পী হয়ে শিল্পের অপমান করা অন্যায়। শিল্পীর অপমান প্রকারান্তরে শিল্পেরই অপমান!

পরে বন্ধুবান্ধবদের কাছে অমলের পরিচয়-অবস্থা জেনে, ইরাণী মর্মাহত হয়েছে। ইরাণী আগে জানলে, কখনোই 'নীলমাটি'র নায়কের জন্য পলাশ-কুমারকে নিয়ে যেত না।

অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে ভেতর। বেচারা! দারিদ্র্যের চরম সীমায় পেঁাছেছে। নতুন অভিনেতা। নায়কের ভূমিকা পাচ্ছিল, সে সুযোগে বাদ সাধল ইরাণী ধূমকেতুর মতো এসে পড়ে। সব ভেস্তে গেল।

বাড়িতে ফিরে এসেও, ইরাণীর বারবার মনে পড়েছে অমলের কথা। কি ভাবল? অত ঘৃণা অত বিরক্তি ঝরে পড়ল কেন দু'চোখ থেকে? ইরাণী লোক না আনলে, ওর চাকরি থাকত। সর্বনাশ করে দিল ইরাণীই।

অমলের এসব ভুল ভেঙে দিতে হবে। ইরাণী ওর প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে মঞ্চ-চিত্রজগতে। তার নিজের অজান্তে যে ভুল হয়ে গেছে, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবেই তাকে।

এরপর থেকে ইরাণী অনুসরণ করেছে অমলকে। যে হলে অভিনয় করেছে অমল, সে হলে গেছে। কখনো উইংসের পাশ থেকে দেখেছে ওর অভিনয়। কখনো দর্শকের আসনে বসে দেখেছে। দুজনের দৃষ্টিবিনিময় হয়েছে অনেক সময়। কিন্তু সেটা সুখকর হয়নি মোটে। দুঃখ অভিমান বেড়েছে বই কমেনি।

মানুষটার একই ভাব।

কোন পরিবর্তন হয়নি। যতবার দেখেছে, ততবার অমলের প্রথম দিনেরই মুখ দেখেছে স্পষ্ট। আগের ধারণার ছাপ পুরোমাত্রায় বর্তমান। কোন হেরফের হয়নি।

গানের সময় উইংসের পাশ থেকে, দর্শকের আসন থেকে সরে যেত ইরাণী। যদি তাকে দেখে, বিরক্তিতে গানের ভাব নষ্ট হয়ে যায়, বেসুরো বেতালা হয়ে পড়ে।

ডেকে পাঠিয়েছে বাড়িতে। অমল আসেনি। এই অমলই একদিন এলো। না ডাকতেই। এলো, আর গেল না।

শাহানামপুরে অভিনয় করতে গেছে ইরাণী। বেলাদের গ্রুপ নিয়ে গেছে। অভিনয় শেষে বাড়ি ফিরছে।

একই ট্রেনে গ্রুপের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা উঠেছে। ওরাও শাহানামপুরের অন্য পাড়ায় অভিনয় করতে গেছে সেদিন। ও গ্রুপে ছিল অমল। বেলাদের গ্রুপে ডাকা হয়েছিল। ইরাণী আছে শুনে, আসতে চায়নি। একথা বেলার মুখে শুনেছিল ইরাণী যাওয়ার আগে।

ইরাণীর জিদ বেড়েছিল দ্বিগুণ। যে কোন প্রকারে অমলকে ধরতেই হবে।

ধরা পড়ল অমল একই কামরায়। একেবারে সামনাসামনি। মাত্র এক হাতের তফাত। কামরায় উঠে অবাক হয়েছিল অমল। ইরাণী? নেমে পড়তে যাচ্ছিল, বাধা দিল ইরাণী নিজেই।—দাঁড়ান! যাবেন না, ট্রেন চলতে শুরু করেছে।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল নিচে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে বেলা। মোটা মানুষ। আসতে একটু দেরী হয়ে গেছে। উঠতে পারেনি ট্রেনে। ঝুঁকে পড়ে দেখছে ইরাণী। নামার চেষ্টা করছে।

বেলা চিৎকার করে বলছে, নামিস নে ইরাণী, নামিস নে! আমি না হয় পরের ট্রেনে যাবো।

তা কি হয়, একলা—

ইরাণীকে হাত দিয়ে আটকাল অমল। বলল, আমিই যাচ্ছি পরের ট্রেনে ওকে নিয়ে। লাফিয়ে পড়ল ট্রেন থেকে অমল।

ইরাণী কখনো কারো কোন কথা শোনেনি। নিজের বুদ্ধিতেই চলে। চলেছে বরাবর। লাফিয়ে পড়ল ট্রেন থেকে শতজনের বাধার আর্তনাদ সত্ত্বেও।

চোট লাগল মাথায়। অচৈতন্য ইরাণীকে বুকের মাঝে সযত্নে তুলে নিল অমল। রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরেছে। অমলের বুক ভিজে যাচ্ছে ইরাণীর রক্তে।

জ্ঞান হতে চোখ মেলে দেখল ইরাণী, দুটি চোখ তার মুখকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। কার চোখ? এত করুণা-সহানুভূতি উপচে পড়ছে দুটি সজল চোখে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটছে, কাটল। স্পষ্ট হয়ে উঠল অমলের মুখখানা। কথা কইতে যাচ্ছিল, মানা করল অমল।—এখন কথা কইতে বারণ করছে ডাক্তারবাবুরা।

···বাড়ি ফিরিয়ে এনেছে ইরাণীকে অমল। দিনরাত কাছে থেকে সেবা করেছে। ইরাণী মুগ্ধ চোখে দেখেছে আর ভেবেছে। লোকটার এত ক্ষমতাও আছে! যে লোককে দেখেছে স্টেজে, সে বুঝি এ নয়। এ দেবতা।

দিন কতক বাদে ইরাণী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

ইরাণী কৃতজ্ঞ অমলের কাছে। উঁচু মহলের বন্ধুদের সঙ্গে অমলের পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের অনুরোধ করল ওকে খ্যাতনামা অভিনেতা করে গড়ে তোলার জন্য।

ছ'মাসের মেলামেশায় অমল-ইরাণীর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। ঘনিষ্ঠতার সেতু ধরে স্বাভাবিকভাবেই দূরত্বের 'আপনি' অতি কাছের 'তুমি' হয়ে দাঁড়াল।

দীর্ঘদেহী সুপুরুষ অমল অল্প সময়ের মধ্যে খ্যাতির শিখরে উঠল। ইরাণীর প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়েছে। অভিনয়-দুনিয়ার পূর্ণতা এসেছে—অমলের। অমলের কাছ থেকে এবার সরে যেতে হবে ইরাণীকে দূরে—অনেক দূরে। প্রীতির

সম্পর্ক বজায় থাকবে, এতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয় থাকবে না কোনদিন।

একটা ত্রাস থেকে থেকে উঁকি মারে এখনো। আঁকড়ে ধরে রাখার স্পৃহাই হয়তো বন্ধন ছিন্ন করে দিয়েছে অতীতে।

হারাতে হয়েছে বীরেনকে।

বীরেনকে হারাতে হাহাকার করে উঠেছিল ভেতর-বার। জলে-ডোবা মানুষ ঘাসের টুকরোকেও আশ্রয় ভাবে। ইরাণীর মন হতাশার সমুদ্রে ডুবেছিল যখন, তখন নিজের অজ্ঞাতে অবলম্বন করে নিয়েছিল একটা মান-অভিমানের পালা আর ভুল বোঝাবুঝির সূত্র ধরে। তা না হলে একটা লোককে প্রতিষ্ঠা করানোর উদ্দেশ্য নিয়ে মেলামেশায় এমন করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল কেন তার ওপরই !

বীরেন ভালোবাসার অভিনয় করেছে প্রথম থেকে। অমল তা করেনি। তার আসল রূপই দেখেছে ইরাণী। দেখেছে একজন ভীষণ একগুঁয়ে নীরস মানুষ। ধার ধারে না কারো। ভাঙবে তো মচকাবে না। একটা আত্মম্ভরিতার প্রতিমূর্তি।

কঠিন পাহাড়ের ফাটল থেকেও জল বেরোয়। অমলের পাথুরে মনে চিড় খেতে দেখেছে ইরাণী। মমতার জল দেখেছে তার সেবার সময়। আচার-ব্যবহারে অকৃত্রিম মনে হয়। ভালোবাসে, এটা বোঝা যায় বেশ। নীরব প্রেমিক ভালোবাসাকে কথা কয়ে উচ্ছৃস্ট করতে চায় না।

ইরাণীর বিচ্ছিন্ন জীবনের ব্যথা বুঝেছে ও। দুঃখ প্রকাশ করেছে বহুবার। বলেছে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি বীরেন নই। তোমার মন তোমার প্রকৃতি —সমস্ত জেনেশুনেও বিয়ে করতে চাইছি আমি। আমার দিক থেকে তোমার কোনরকম অশান্তি আসবে না। হলফ করে বলতে পারি, তুমি নিশ্চয় সুখী হবে।

ইরাণীর সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠেছে অশুভ আশঙ্কায়। কি শুনছে ! বীরেনের কথাই শুনল যে আবার অমলের কণ্ঠে !

ইরাণী কি এবারও ভুল করল ? অনেক লোকে দেখে শেখে, অনেকে ঠকে। অনেকে আবার দেখে ঠকেও শেখে না। ইরাণী কোন দলের ? দেখেছে কত পুরুষ, শিক্ষা হয়নি তো কিছু। ঠকেছেও। শিক্ষা পেয়েছে কি ? না। তবে কি ইরাণীর ঠকে-দেখেও শিক্ষা না হওয়ার ফল ভোগ করতে হবে জীবন-ভোর ! আবার বিচ্ছেদ আবার আঘাত।

মায়ের কথাই সত্যি হবে সব ? বীরেনের কথা বলেছিল, ভুল করছো। ভুল প্রমাণও হয়ে গেল। মাথা চাপড়াতে ইচ্ছে করছে ইরাণীর। স্কুল-কলেজে কোনদিন বোকা মেয়ে কেউ বলেনি তাকে। মেধাবী ছাত্রী বলে খ্যাতি ছিল। খ্যাতির মোহ এমনিই পেয়ে বসেছিল, কেউ ঠাট্টা করে বোকা বললেও, আপাদ-মস্তক জলে উঠত রাগে।

মেধাবী ইরাণীর আজ এ কি দুর্গতি ! প্রতি পদে পদে বোকা বনে যাচ্ছে। অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর আহাম্মুক সাজতে পারবে না। লোকের

হাসির খোরাক হতে সাধ নেই আর তার।

অমলের ব্যাপারেও হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে বলেছে মা। প্রাণেশ এসেছিল। উপদেশ দিয়ে গেল, তুমি বার বার ব্যথা পাও—এটা মোটেই পছন্দ নয় আমার। আবার ভুল করছো কিন্তু।

মা প্রাণেশই অনবরত ভুল পথে ঠেলে দিচ্ছে। উপদেশ নাই বা শুনিয়ে গেল ওরা দয়া করে এসে এসে। উপদেশের চোটে মাথায় জিদ চেপে বসে। নিষেধের বাঁধ ভাঙতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ভালোমন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আগুনকে বরণ করে নিয়ে, পুড়ে ছারখার হয়ে যায় শেষে।

আর আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ইচ্ছে নেই ইরাণীর। হতে পারে অমল আগুন নয়—তার চিন্তাধারা ভুল, তবু পোড়খেকো ইরাণীর মন সংশয়ের দোলায় দোলে মাঝে মাঝে। তাই অমলকে খুব কাছে পেতে চায় না। দূরে রেখে দেখতে চায়—ভুল করছে, কি ঠিক করছে।

অমল উত্ত্যক্ত করে তুলতে লাগল ইরাণীকে দিনের পর দিন। ইরাণী তাকে বিয়ে না করলে, আত্মঘাতী হবে। ইরাণীর জন্যই অমলের যশ-মান-অর্থ সব কিছু। এ সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে যাবে অমল। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মতো। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর মতো দেশ ছেড়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াবে যারা জীবন। যার জন্য আমীর হয়েছে তার জন্য ফকির হবে না হয়।

ইরাণী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

অমলের আগের প্রকৃতি জানে। লোকটা মুখে যা বলছে, কাজেও তাই করতে পারে। ওর পক্ষে অসম্ভব নয়।

হাতে গড়া অভিনেতার মৃত্যু হতে দেবে ইরাণী এইভাবে ? এত বড় প্রতিভার নিঃশেষ দেখবে স্বচক্ষে ? ইরাণী রাজী হয়েছে বিয়ে করতে।

মুখের কথায় আর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানানোর দাম কি ? মত পরিবর্তন হতে কতক্ষণ ? অত কাঁচা ছেলে নয় অমল। পাকা কাজ করিয়ে নিয়েছে ইরাণীকে দিয়ে। মাথায় হাত দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছে। কথার নড়চড় করার উপায় নেই কোন।

বিয়ের পর ইরাণীর আংটিটা নিজের আঙুল থেকে খুলে, ইরাণীর আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল অমল। ইরাণী নিতে চায়নি। বলেছে, উপহার আমার ধাতে সয় না।

—সয়। আমারটা সইবে।

—তুমি যে তোমার অন্তর উপহার দিয়ে দিয়েছ বলেছিলে আমায় ?

—ঠিক কথাই তো বলেছিলুম।

—অন্তরের চেয়ে কি আংটিটা বড় হল ?

—অন্তর তো দেখা যায় না। অনুভবের জিনিস। অন্তরকে মনে করার স্মৃতি এটা।

দিন গেছে মাস এসেছে। মাস গেছে বছর ঘুরেছে। এক এক করে দুটি বছর কেটে গেল। দু'বছরের মধ্যে অমলের কোন অন্যায় আচরণ দেখেনি ইরাণী। দেখল দু'বছর পর। যেটা পছন্দ করে না, সেইটাই বেশি করে করে করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে সদাসর্বদা। খুঁটিনাটি নিয়ে খিটিমিটি বাধে দুজনে।

একদম পছন্দ করে না ইরাণী নেশা করা। কিন্তু মদের নেশায় টং হয়ে বাড়ি ফিরবে প্রতি রাতে অমল। অভিনয় ছেড়ে দিয়ে, বেলাকে নিয়ে দিনরাত টো-টো করে বেড়ানোই হচ্ছে। নাওয়া-খাওয়ার নাম নেই।

এসব অনিয়ম করার কথা বললে, রাগে ফেটে পড়ে অমল। বলে, যার পোষাবে, সে থাকবে। না পোষাবে, চলে যাবে। কারো পরোয়া করবো না। নিজের পয়সায় খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি। লোকের কথা শুনতে বাধ্য নই।

ক্রমশ এত বেপরোয়া হয়ে উঠল অমল, কোন প্রতিবাদ করলেই, সঙ্গে সঙ্গে ইরাণীর গায়েও হাত পড়ত।

একদিন নেশার ঘোরে, রাগের মাথায় সমস্ত গোপন কথা বেরিয়ে পড়ল অমলের মুখ থেকে।

বেলার মতো দুনিয়ায় কেউ আর ভালোবাসে না তাকে। বেলার জন্যই বড় অভিনেতা হয়েছে সে। বেলা যদি ইরাণীকে না ধরে, পলাশকুমারকে না নিয়ে যেত 'নীলমাটি'-র অভিনয় করতে, তাহলে ইরাণীর নজর পড়ত না কখনো তার ওপর। সহানুভূতি পেত না অমল। চিত্রমঞ্চের উঁচু মহলের ওপর ইরাণীর যথেষ্ট প্রভাব। ইরাণীর সাহায্য ছাড়া তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যেত না। তাই বেলার পরামর্শ মতো সবকিছু করেছে অমল।

জিজ্ঞেস করেছে ইরাণী, বিয়ে না হলে আত্মঘাতী হওয়ার কথাটাও কি বেলার শেখানো ?

—নিশ্চয়, বেলার শিক্ষা ছাড়া এক পা চলিনি। চলবোও না।

—বেলাকে বিয়ে করনি তবে কেন ?

—তারই বারণের জন্য।

—এ বিয়ে করতে মত দিয়েছিল বেলা ?

—নিশ্চয়।

কাঁদতে কাঁদতে অমলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে ইরাণী। আকাশে কালো মেঘ। থমথমে ভাব একটা। ঝড় ওঠার পূর্বাভাস।

...ট্যাক্সিতে উঠে বসল ইরাণী।

গাড়ি চলছে। ইরাণীর চোখের জলে রাস্তাঘাট ডুবে যাচ্ছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব ঝাপসা হয়ে আসছে। দুটি ভুলই মারাত্মক ইরাণীর জীবনে। মা হাসবে, হাসবে প্রাণেশ। ওদের মুখ দেখাবে কি করে ? যা যা বলেছিল ওরা, হাতে হাতে ফলে গেছে। নির্ভুল গণনা।

স্বামীত্যাগিনী হতে হবে ইরাণীকে দ্বিতীয়বারও। বিচ্ছেদের মামলা শুরু হবে অমলের সঙ্গে। ইরাণী কি করবে? কোথায় যাবে?

—মেমসাব! কাঁহা জায়েঙ্গে?

ড্রাইভারের ডাকে ফিরে এলো ইরাণী নিজের মধ্যে। হাতের ইঙ্গিতে পথ দেখিয়ে দিল।

…বাড়ি।

বাইরে ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। ইরাণীর ভেতরের ঝড়ের প্রবল ধাক্কায় পিষে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে এলো। দূর থেকে দেখছে সুরবালা। ইরাণী টলছে, পড়ে যাবে হয়তো। পেছন থেকে ধরতে যাচ্ছিল, থমকে গেল। ঘরে ঢুকেছে ঠিকই। খাটের ওপর বসেছে। বুকে বালিশ চেপে ধরে ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছে। শুয়ে পড়ল বুকে বালিশ চেপেই।

কষ্ট দেখে, সুরবালার কষ্ট হচ্ছে। আঁচলে চোখ মুছলো। ইরাণীদি প্রাণ দিয়ে বকলে-মারলেও, ভালোবাসেও প্রাণ দিয়ে।

মা কাজ করত ওদের বাড়ি। সুরবালা থাকত মায়ের সঙ্গে। ইরাণীদিদি-সুরবালা দুজনে খেলার সঙ্গী ছিল। বড় হয়েও ইরাণীদি ছাড়তে পারেনি তাকে। ঝিয়ের মেয়ে বলে কোনদিন ঘেন্না করেনি। লোকসমাজে পরিচয় দিত—সুর আমার ছোটবোন। বোনের মতোই দেখত। দ্যাখে এখনো। নিজে খরচ করে পানঅলা ভুলুয়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। মা রাজী হয়নি এ পাত্রে বিয়ে দিতে। ইরাণীদির কাছে কেঁদে পড়েছিল সুরবালা।

—আমায় বাঁচাও ইরাণীদি।

—সত্যি কি তুই ওকে ভালোবাসিস সুর?

—তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, সত্যি।

—ওর কি তোর ওপর সত্যি ভালোবাসা আছে?

—আছে।

—বুঝলি কেমন করে?

—আমার জন্য পানদোক্তা নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁ-করে চেয়ে বসে থাকে। কখন আমি যাবো। বলে, তুই না এলে, মনটা আমার খাঁ-খাঁ করে। মনে হয়, দোকানের ঝাঁপ ফেলে দি। কি হবে পয়সা কামিয়ে! কার জন্য! তুই যদি না এলি ঘরে, জীবন থেকে লাভ কি?

—ওর! হ্যাঁ, ভুলুয়ার ভালোবাসার নমুনা পেলুম বটে! এসব কথা শুনে, তুই কি উত্তর দিস?

—বলি, আ-মর্ মিনসে! পোড়ার মুখে আর বলিস না, জীবন থেকে লাভ কি! ভালো করে জেনে রাখিস, সুর বেঁচে থাকতে মরতে দেবে না তোকে। এটা বুঝিস না কেন—কাজকর্ম আছে তো আমার? যখন-তখন আসা যায় নাকি?

—জবাব দেয় কি ও ?

—জবাব ? জবাব দেয়—সব বুঝি মাইরি। বুঝেও পোড়া মনটা সময়-সময় বড্ড অবুঝ হয়ে ওঠে। দোকান খোলার সময় তোর মুখখানা দেখলে দিনটা ভালো যায়। দু'পয়সা রোজগার হয়। একেই বলে ইস্তিরীর ভাগ্যে ধন। সোডার বোতল দেয়ার ছুতো করে আসিস না একবার মাইরি। দুপুরের দিকে একবারটি না দেখলে, খিদে হয় না। মুখে ভাত ওঠে না। রাত্তিরে দোকান বন্ধের সময় না দেখলে, রাতভোর চোখ বুজতে পারি না একটুও। মনটার ভেতর হু-হু করে।

—বুঝেছি। এ বিয়ের ভার আমি নিচ্ছি। ভাবিসনি।

ইরাণীদির জন্যই আইবুড়ো নাম খণ্ডন হয়েছিল সুরবলার। কিন্তু সুখী হয়নি সে। বিয়ের এক মাস পরেই, গলার হার হাতের বালা খুলে নিল ভুলুয়া—দোকান বড় করবে। অনেক আয় হবে। তা থেকে সুরবালার গা ভর্তি গয়না করে দেবে।

কিছুদিন বাদে দেখা গেল, লোকটার কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। ভুলুয়া যে তাকে ছেড়ে পালাবে, এটা বিশ্বাস করতে পারেনি প্রথমে।

ভেবেছিল, গয়না কাছে আছে জেনে, গুমখুন করেছে কেউ। নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছিল সুরবালা। পাগলের মতো হয়েছিল ভুলুয়ার জন্য।

সে সময় ইরাণীদিই বলেছিল, অত ভাবিস নে সুর। পুরুষের মন বোঝা ভার। ভুল হয়েছে তোর ওকে বুঝতে। খুঁজে পেতে দ্যাখ। নিশ্চয় তোর মতো কাউকে ফাঁসিয়েছে। তাকে নিয়ে পালিয়েছে তারও সর্বনাশ করার জন্য।

ইরাণীদির ভবিষ্যৎ-বাণীই সত্যি হল।

মোড়ের বাড়ির পাঁচুবালার সঙ্গে পালিয়েছে ভুলুয়া। যে বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করত পাঁচুবালা, সেই বাড়িরই মহাদেব চাকর সব বলল।

মহাদেবের সঙ্গে হাসিমশকরা করে করে প্রত্যেক মাসে মাইনের টাকার অর্ধেক নিয়ে নিত পাঁচুবালা নানান জিনিস কেনার অজুহাত দেখিয়ে। রাগে রক্তচক্ষু মহাদেবের। পাঁচুবালা-ভুলুয়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হন্যে হয়ে।

দেখতে পেলে দুজনকে একসঙ্গে শেষ করবে। কত ন্যাকামি না করেছে পাঁচুবালা মহাদেবের সঙ্গে! স্বপ্নে দেখেছি। কে যেন বলছে—আগের জন্মে তুই আমার সোয়ামী ছিলি। আমি তোরই রে। আর কারো নয়—আর কারো নয়—তে-সত্যি করছি।

ইরাণীদি সব শুনে বলেছে, নিজেকে শুধরে নে এবার সুর। ওকে ভুলে যা, ভুলে যা। ভুলুয়া এবার সমানে সমানে পড়েছে।

যে ইরাণীদি মানুষ চেনে, এত বোঝে, সেই ইরাণীদিই ভুল করল বীরেন-বাবুর বেলায়। বীরেনবাবুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় ইরাণীদির এই চেহারা এই যন্ত্রণা দেখেছিল। তবে কি অমলবাবুর সঙ্গেও—। ঈশ্বর! ইরাণীদিকে

শান্তি দাও! মানব-ঝির একই বরাত করলে কেন তুমি?

ইরাণী ভুল করেছে। নিজেকে সংশোধন করার কি কোন পথ নেই আর?

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে, ইরাণীর অন্তরে-বাইরে একটা অন্তহীন অবিরাম সংগ্রাম চলছে। কেন এই সংগ্রাম? ১৯৪০ সনের রক্তক্ষয়ী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জন্মেছে বলে?

ইরাণীর জীবনযুদ্ধে অপর পক্ষই জয়ী হচ্ছে। ইরাণী পরাজিত। বেশ মনে পড়ে ইরাণীর। ওদের বাড়িতে নিগ্রোসৈন্যরা আসত। ইরাণী পালাত ভয়ে। ওদেরই একজন বিশাল বাহু বাড়িয়ে টেনে নিয়ে আসত। কোলে তুলে নিত। দু'গালে টোকা মেরে কোল থেকে নামিয়ে দিত আবার।

হা-হা করে সে কি হাসি! উষ্ণ নিশ্বাসের তীব্রগন্ধে নাক জ্বালা করত ইরাণীর। প্যাণ্টের পকেট থেকে লজেন্স বার করে হাতে গুঁজে দিয়ে তিনতলায় উঠে যেত।

আসত আমেরিকানরাও। ওরা অনেক রকমের ছোট ছোট খেলনা দিত। মুখে চকোলেট পুরে দিয়ে পাঁজাকোলা করে দোলাত ইরাণীকে। ঘরে ঢুকে বিছানায় শুইয়ে দিত হাসতে হাসতে।

গোটা কতক চকোলেট বিছানায় ছুঁড়ে দিত ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে।

ইরাণী জানলায় দাঁড়িয়ে কত লোককে সৈন্যদের ট্রাকের চাকায় পিষে যেতে দেখেছে।

মাকে এসে জড়িয়ে ধরত ভয়ে। প্রাণেশ অভয় দিত, ভয়ের কি আছে ইরা? আমরা বড় হয়ে ওদের মুণ্ডু ছিঁড়ে নেবো।

দুর্গারানী হাসত। বলত, দ্যাখ দিকিনি প্রাণেশের কি রকম সাহস। তোর চেয়ে তো বছর দুয়েক বেশি বড় নয় ও। মেয়ে কেঁদেই অস্থির সবেতে।

চিবুক ধরে আদর করত দুর্গারানী।—ছি! পাগলী কোথাকার! তুই কাঁদবি কেন? তোর ওপর আমার যে অনেক আশা রে! বড় হয়ে সকলকে তুই-ই কাঁদাবি, নিজে হাসবি।

ছ'বছর বয়সের ইরাণী মায়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। মায়ের হেঁয়ালি বোঝেনি তখন। বড় হয়ে বুঝেছিল। বীরেনের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে মা বলেছিল, তুই কাঁদাবি কোথা, তা নয় কেঁদে মরতে যাচ্ছিস।

ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত দুর্গারানী। বিছানায় শুয়ে ইরাণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, শাড়িটাও বদলায়নি। স্টুডিও থেকে ফিরে এসেছে ও ঘণ্টাখানেক। যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড!

দুর্গারানীর কপালের মাঝখানে কোঁচকানো রেখাতে আগুনের লাল আভা ফুটে উঠেছে। মুখ জুড়ে বিরক্তির ছাপ। এ মেয়েকে নিয়ে পারা যাবে না আর।

দুর্গারানী তো তার মায়ের কোনদিন অবাধ্য হয়নি। যখন যা বলেছে, মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। সেই মতো কাজ করেছেও। ফল তো কিছু খারাপ হয়নি। আজ দুখানা বাড়ি। বাড়ি ভর্তি ভাড়াটে। গা-মোড়া গয়না— কি না নেই! সম্মান কত দুর্গারাণীর! সবার বাড়িওলী-মা।

বাড়িওলী-মা'র আদরের দুলালী ইরাকে ভাড়াটেরা কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। ভুঁয়ে পা পড়তে দেয়নি মেয়ের। পুরনো ভাড়াটে প্রাণেশের মায়ের তো কথাই নেই। ইরাণীকে কাছে পেলে, বুক থেকে নামাতে চায় না একদম। মেয়ের জন্য দুর্গারানী কি না করেছে!

ভালো নামী ওস্তাদ রেখে, যত রকম গান, যত রকম নাচ—সব শিখিয়েছে। এখনকার যুগে বাইজীর গানের সমঝদার নেই বললেই চলে। ইংরিজি নাচ-গানের কদর বেড়েছে। তা-ও শেখাতে ত্রুটি করেনি। ইংরিজি লেখাপড়াও ভালো করে শিখিয়েছে। বি, এ পাশ করেছে ইরাণী।

মেয়েকে নিয়ে অনেক আশায় বুক বেঁধেছিল দুর্গারানী। মেয়ে এত গুণী, মেয়ে তার শতগুণ পয়সা উপায় করবে। সমস্ত ব্যর্থ হতে বসেছে। অনেকবার সাবধান করে দিয়েছে মেয়েকে!—কারো ঝোঁকে পড়বি নে কখনো! সব গুণ নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে।

সেই ঝোঁকে পড়ল মেয়ে! বরাত বলিহারি, বীরেনকে বিয়ে করার জন্য উন্মাদ একেবারে। কেঁদে ভাসাচ্ছেন। গম্ভীর গলায় দুর্গারানী ডাকল—

ইরা, ওঠ্! এখনো বলছি বীরেনকে ছাড়্ তুই! মিলন আসবে এখুনি। তোকে যেতে হবে ওর সঙ্গে। মনে রাখবি, বহু পয়সার মালিক ও। হেলা-ফেলা লোক নয়, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিস নি! ডিরেক্টরদের দশা তো দেখতে আর বাকি নেই তোর! কখনো পৌষ মাস কখনো সর্বনাশ। তার ওপর নিজে এমন কিছু করতে পারেনি এখনো। তোর কাছে খুব বিখ্যাত হতে পারে, অন্যের কাছে তা মোটেই নয়—এটুকু ভালো করে জানিস। চোরা-বালির ওপর ঘর বাঁধতে যাস নে। কেঁদে কূলকিনারা পাবি নে বলে দিলুম!

মেয়ের মনে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে দুর্গারানী দেখছে মেয়ের মুখ। কয়েক মুহূর্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। যেন জনমানবশূন্য। দুর্গারানী ভাবল, হয়তো ওষুধ ধরেছে রুগীকে। আবার উপদেশ দেওয়া শুরু হল।— মা হয়ে রাস্তায় বসাতে পারি নে তোকে। অনেক পুরুষ এসেছে জীবনে। জ্ঞানও হয়েছে যথেষ্ট। আমাদের কেউ সমাজে তুলতে চায় না। কেউ কেউ চায় মুখে। তাদের ব্যবসার খাতিরে। এই তো বীরেনের মা-বাবা কি ঘরে নিতে চাইছে তোকে? তারা তো সাফ কথা বলে দিয়েছে, ও মেয়েকে বিয়ে করে আনলে, ঘরে স্থান নেই। বিষয় থেকে খারিজ হয়ে যাবে বীরেন।

এতক্ষণ ইরাণী চুপ করে ছিল। আর পারল না। মায়ের উপদেশে আর বোঝানোয় কানের ভেতরকার পর্দা অবধি জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। অসহ্য। তীক্ষ্ন

কণ্ঠে বলে উঠল ইরাণী, বীরেনকে বিয়ে আমি করবোই। কেউ রুখতে পারবে না। স্বয়ং ভগবান এলেও না। তোমাকে যদি ছাড়তে হয়, এ বাড়ি যদি ছাড়তে হয়—তাতেও প্রস্তুত।

দুর্গারানী কখনো কারো চোখরাঙানি-শাসানি বরদাস্ত করেনি। বরং সকলকে সে-ই চোখ রাঙিয়েছে, শাসিয়েছে। ইরার ভালোর জন্যেই বলা। চোখের সামনে কেউ আগুনে ঝাঁপ দিক—এটা কোন লোকই চায় না। চোখের বাইরে যা ইচ্ছে করুক ইরা। দুর্গারানী দেখতে পাবে না॥

ভালো করার চেষ্টাকে মায়ের দুর্বলতা ভেবে নিয়েছে ইরা? ভেবেছে, কন্যাস্নেহের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ও যা নয় তাই করবে? কিছুতেই সহ্য করবে না দুর্গারানী কোন অন্যায়। মনে করেছে, 'দুর্গারানীকে ছাড়বো' বললে, 'বাড়ি ছাড়বো' বললে, মেয়ের আব্দার মেনে নেবে মা। দুর্গারানী সে মা নয়। ক্রোধে ফেটে পড়ল দুর্গারানীর কণ্ঠস্বর।

—বেশ! আমার এখানে থাকা চলবে না! যেখানে চলে যেতে ইচ্ছে, যেতে পারিস। বিদ্যুৎগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দুর্গারানী।

ইরাণী প্রস্তুত হচ্ছে যাওয়ার জন্য। সামনে এসে দাঁড়ালো প্রাণেশ। ইরাণীর গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে টসটস করে।

—প্রাণেশ! মা বুঝল না আমায়। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছি আমি এই অপরাধ। মায়ের মতো হতে পারলুম না বলে, মায়ের রাগ॥ দু'পুরুষের জীবন তিন পুরুষে বদলে যেতে পারে না কি প্রাণেশ? তুমি না বলেছিলে—পারে। সত্যকামের কি হয়নি?

গলায় কান্না, চোখে কান্না, কথায় কান্না ইরাণীর। ফোঁপাতে ফোঁপাতেই বলল, বলেছিলে তুমি—সত্যকাম আমাদের মতো ঘরেরই ছেলে। বাপের নাম জানত না। জানত না গোত্র। কবির 'ব্রাহ্মণ' কবিতা শুনিয়ে কতবার সান্ত্বনা দিয়েছ আমায়।

'উঠিলা গোতম ঋষি ছাড়িয়া আসন,
বাহু মেলি বালকেরে করি আলিঙ্গন
কহিলেন, অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।'

প্রাণেশেরও গলাটা ধরে এসেছে। বলল, যাওয়ার আগে একটা কথা শুনবে?

—বল।

—আমার স্বার্থের জন্যে বলছি না। তোমাতে-আমাতে কি কথা হয়েছিল বি. এ পাশ করার পর? মনে আছে?

—আছে। তুমি বলেছিলে, যে সমাজে জন্ম আমাদের, সেই সমাজ থেকেই সত্যকামের সৃষ্টি করতে হবে। সে দায়িত্ব তোমার-আমার। স্কুল-কলেজে অপরের বাবার নামে আমরা পরিচিত। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সে গ্লানি,

যন্ত্রণা পেতে হবে না। তারা প্রকৃত পিতার পরিচয়েই পরিচয় হবে। তুমি-আমি দু'জনে বিয়ে করে সেই সমাজ গড়ে তুলবো। আমাদের ছেলেমেয়েদের এইভাবে আমাদের মতো স্বামী-স্ত্রীর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এ সমাজের আমূল পরিবর্তনের সূত্রপাত করতে হবে। হয়তো আমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হতে সময় লাগবে—অনেক পরেও হতে পারে। তখন পৃথিবীতে থাকবো না আমরা, থাকবে না বোধ হয় আমাদের বংশধরেরা। কিন্তু তখন যে সমাজ বেঁচে থাকবে—অতীতের কোন গন্ধ থাকবে না তাতে। থাকবে না কলঙ্কের লেশ মাত্র।

—তুমি কি সেই প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছো ইরা ?

—না, প্রতিশ্রুতিরও পরিবর্তন হয় পরিস্থিতি-পরিবেশের জন্য। তোমার চিন্তাধারা অনেক দূরের। আমার বর্তমানের। তোমাকে বিয়ে করলে, সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবো না আমি যেমন, তেমনি আমাকে বিয়ে করলে, তোমারও একই দশা হবে। বীরেনদের নাম করা ঘর। উঁচু মহল। এখুনিই সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবো। তোমার উঁচু মহলে বিয়ে করা উচিত একই যুক্তিতে।

—ভুল করছো তুমি ইরা! বীরেন যদি বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় তো ভালো। তোমার ছেলের পিতার পরিচয় দেয়, ভালো। তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে। তা না হলে, চরম আঘাত পাবে তুমি। বুঝে দ্যাখো !

—অনেক বুঝেছি। আর বোঝাতে এসো না কেউ তোমরা। দয়া করে চলে যেতে দাও !

সরে দাঁড়াল প্রাণেশ।

লকেটের ফটোটা কেন এত জীবন্ত হয়ে উঠছে আজ ? যেদিন চেনহারটা এনেছিল প্রাণেশ, সেদিনও তো এমনটি দ্যাখেনি ইরাণী ! নতুন সমাজ গড়ার, প্রাণেশকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর, যখন হারটা গলায় পরিয়ে দিয়েছিল প্রাণেশ, তখন ইরাণীর অঙ্গে অঙ্গে আনন্দের শিহরন লেগেছিল। লকেটের ফটোর প্রাণ দ্যাখেনি সে সময়ও। তখন প্রাণেশের চোখের তারায়-তারায়, অমরালোকের পুলকের ঢেউ খেলতে দেখেছে কেবল।

আজ ইরাণীর এই দুদিনে প্রাণেশকে একবার দেখার জন্য মন আকুলি-বিকুলি করছে। ইরাণীর দেখতে ইচ্ছে করছে প্রাণেশের সেই আয়ত দু'চোখ।

খাট থেকে নামল ইরাণী। ড্রেসিংটেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

আস্তে আস্তে চেনহারটা তুলে নিল। লকেট নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিছুক্ষণ। লকেট থেকে চোখ তুলতে বিস্ময়বিমূঢ়। প্রাণেশ দাঁড়িয়ে সামনে। অপলক চোখে তাকিয়ে আছে মুখের দিকে।

ইরাণী কি স্বপ্ন দেখছে ? চিন্তার পূর্ণ রূপ দেখছে হয়তো কল্পনার চোখে। হাত দিয়ে রগড়ে নিল দু'চোখ। না, ঠিকই দেখছে। রক্তমাংসের শরীরের

মানুষ। সত্যিই প্রাণেশ। তবুও নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য, স্পর্শ করে দেখছে প্রাণেশের আপাদমস্তক। কাপড়জামা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে একেবারে বৃষ্টিতে।

কি করে এলে, ইরাণী জিজ্ঞেস করতে পারল না। করতে গিয়েও ভুলে গেল। ইরাণী দেখছে।—দেখছে—দেখছে—দেখছে।

একটা অজানা আনন্দের ঢেউ খেলছে ইরাণীর বুকের ভেতর। নিজের নিশ্বাসে কে যেন কথা কয়ে উঠছে। ইরাণী শুনছে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে! আমার ডাক শুনে তুমি এসেছো প্রাণেশ! বুঝিয়ে প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিতে আর নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে। কেন তুমি জোর করে আমায় আটকালে না তখন? আমায় ছেড়ে যেও না আর! ইরাণীর ঠোঁট কাঁপছে। মনের কথা মুখে বলতে চেষ্টা করছে।

প্রাণেশ তাকাল ইরাণীর হাতের দিকে। বাঁ হাতের আঙুলে চেনহারটা জড়ানো। নিয়ে নেবে প্রাণেশ। বলল, এটা বড় চঞ্চল ক'রে তোলে তোমায়। তোমার কাছে রেখে দরকার নেই।

ইরাণী কাঁপছে থর থর করে। দু'চোখ বলছে, তোমায় আটকানোর জন্য হাত আমার উঠছে না। বেইমানি করছে। আমার জিভও। কথা চেপে রাখছে। বলতে দিচ্ছে না—নিও না! তুমি তো মনের কথা বোঝো। এটা কি বুঝতে পারছো না?

হার নিতে গিয়ে প্রাণেশের হাত সরে এলো আপনা হতেই।

বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। হঠাৎ কি মনে করে পিছু ফিরে তাকাল।

ইরাণী টলছে। দু' পা অবশ হয়ে আসছে। দাঁড়াতে পারছে না।

প্রাণেশ এগিয়ে আসছে তাড়াতাড়ি। ধরে না ফেললে, পড়ে যাবে এখুনি।

বলা শেষে প্রাণেশ আনমনা হয়ে পড়ল একটু। শূন্যে উদাস দৃষ্টি মেলে দেখল কি যেন। দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, একটা সামান্য ব্যাপার। মনে রাখার মতো নয়। জীবনের চলার পথে সে স্মৃতি মন থেকে হারিয়ে মুছে গেছল একদম। কিন্তু হঠাং হঠাং এখন মনে পড়ে যায়। স্মৃতি জীবন্ত হয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়।

এই বেনারসে এসেছিলুম আমরা এর আগে একবার। আমি ইরাণী আর দু'জনের মায়েরা। আমার বয়স তখন বছর বারো, ইরাণীর দশ। তৈলঙ্গস্বামীর সাধনপীঠ দেখতে গেছি। তৈলঙ্গস্বামীর বিরাট কষ্টিপাথরের মূর্তিটির দু'চোখ জলছে যেন জ্বলজ্বল করে। মূর্তি দেখে, তৈলঙ্গস্বামীর প্রতিষ্ঠা করা তারা প্রতিমা দেখতে এগোচ্ছি, প্রতিমার চরণে জবাফুল দিয়ে, মাথা নত করে যে মহিলা পুজো করছিলেন, ফিরে তাকালেন।

মৃদু হেসে আমাদের কাছে চলে এলেন। আমার আর ইরাণীর মুখের

দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিক। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, না না। এ জন্মে আর ওরকম হবে না। ঝামেলা পোহাতে হবে একটু, কিন্তু কেটে যাবে সব।

ইরাণীর মাথায় আমায় মাথায় প্রসাদী ফুল ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করলেন, আগের জন্মে স্বামী-স্ত্রী হতে পারোনি তোমরা, এবার হবে।

মায়েদের দিকে চেয়ে বলেছিলেন তিনি, মেয়েটি এই ছেলেকে পছন্দ করেনি। ছেলে কিন্তু এর জন্য পাগল হয়েছিল। মেয়ে আকৃষ্ট হয়েছে অন্য দুটি পুরুষের ওপর পর পর। তারা বিয়ে করবো বলে, করেনি। মেয়েটি ভেঙে পড়ে বিছানা নিয়েছিল শেষ অবধি। মেয়ের দশা দেখে ছেলেটি অনাহারে-অনাহারে নিজের দেহকে-জীবনকে শুকিয়ে ফেলল একেবারে। শেষে প্রাণ খোয়াতেও হয়েছে। মেয়েটি বুঝেছিল ছেলেটির নির্মল-সত্যি প্রেম। অনুশোচনায় দগ্ধে দগ্ধে মরেছে ছেড়ে চলে যাবার কিছু দিন পরে।

মহিলা আমাদের মাথায় হাত রেখে বললেন, ভয় নেই। এবারে তোরা বাঁচবি। মিলন হবে।

প্রাণেশের কণ্ঠস্বর ভক্তি-বিশ্বাসের আবেশে ভরে উঠেছে। খুব আস্তে আস্তে বলল, তখন অত বুঝিনি। জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, পরিণতি দেখে বুঝেছি উনি আমাদের অতীত দেখেছিলেন, দেখেছিলেন ভবিষ্যৎ। ওঁর কপালের আগুন-শিখার মতো লাল টকটকে সিঁদুরের টিপটা আমার চোখের সামনে এখন স্পষ্ট ভেসে ওঠে। ওটাকে একটা চোখ মনে হয় আমার।

চার

পাহাড় ফাটার আওয়াজটা কানে আসতেই সমস্ত পাথর খনি থরথর করে কেঁপে উঠল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যানেজার। তার নিজের বুক কাঁপবে কেন? এ তো নিত্যকার অভ্যস্ত ব্যাপার। আমার বুক চেপে ধরে হাসতে হাসতে তামাশা করে বলল, ভয়ের কিছু নেই, লাল নিশানের বাইরে আমরা। এখানে পাথর ছিটকে আসবে না।

পাঁচ-ছ তলা সমান মাটির নিচে পাথরখনির গহ্বরের দিকে চেয়ে জোরে নিশ্বাস ফেলে মৌন হয়ে গেল খানিক। মুখের হাসি মিলিয়েছে। চোখে ব্যথার ছায়া। ওপরে—একটু দূরের ইউকেলিপটাস গাছটার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, দেবপ্রিয়াকে নিয়ে অমরাবতীর কি নিদারুণ ভয়…

একটা চাপা ভয়ের রহস্য শিরশির করে কাঁপছে অমরাবতীর বুকের তলায়।

অমরাবতী অনুসরণ করছে দেবপ্রিয়াকে। সংকীর্ণ পথ। একটা মানুষই যেতে পারে কেবল! দু'পাশে মরণ গহ্বর। পাথরখনির বিরাট বিরাট খাদ। যে কোন মুহূর্তে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

আকাশ থমথমে, বাতাস স্তব্ধ।

অন্য কোন লোকজনের চিহ্ন নেই রাস্তায়। গভীর রাতে একটা প্রেতপুরী হয়ে উঠেছে। খনির গা ঘেঁষে চলার সময় অমরাবতীর মনে হচ্ছে, এই খাদ এই পাথর খনি—সব জীবন্ত। কত লোকের প্রাণ নিয়ে নিজেদের প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কি নিষ্ঠুর এরা!

হাজারো সাবধান সত্ত্বেও, ব্লাস্ট করার সময় কত জওয়ানের বুকের কলিজা থেঁতো হয়ে গেছে। পাহাড় ফেটেছে বাজ পড়ার গর্জন করে। বড় বড় চাঁই ঠিকরুলো চতুর্দিকে। যে যাওয়ার, পালাতে গিয়েও সজোরে এসে লাগল তার বুকে একটা। ব্যস, সব শেষ চক্ষের নিমেষে।

মৃদু বাতাস বইতে শুরু করেছে। কি ঠাণ্ডা। মৃতের শেষ নিশ্বাস আছড়ে পড়ছে যেন অমরাবতীর সর্বাঙ্গে। চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিল গায়ে।

দৃষ্টি থেকে মাঝে মাঝে দেবপ্রিয়া হারিয়ে যাচ্ছে উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো রাস্তার ঢালুর দিকে নামছে যখন। আবার দেখা যাচ্ছে উঁচুতে ওঠার সময়। মরাচাঁদের মলিন আলোয় ও যেন কেমন হয়ে উঠছে। চলার ধরনধারণ অন্য রকম। রহস্যময়ী।

জাফরানী রঙের শাড়িটা বিবর্ণ-বিবর্ণ দেখাচ্ছে। দেবপ্রিয়ার বাঁ কাঁধ থেকে

পিঠ বেয়ে শাড়ির আঁচলটা লুটোচ্ছে মাটিতে। কালো কুচকুচে এলো চুল দুলছে।

কে পেছনে কে সামনে—কোন লক্ষ্য নেই। দেবপ্রিয়া আপন মনে চলছে না কিন্তু। চললে তবু ছিল ভালো। এ যেন অন্য কোন মন চালাচ্ছে ওকে। অমরাবতীর তাই-ই মনে হয়। আর এই জন্যই যত ভয় যত সংশয়।

দেবপ্রিয়ার যত কাছাকাছি হওয়ার চেষ্টা করছে অমরাবতী, পারছে না। ও এত জোরে জোরে হাঁটছে যে, নাগাল পাওয়া মুশকিল। সামনে যদি কোন পাহাড় পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকত, তাহলেও ওর চলার গতি থামাত না এতটুকু। পাহাড়ে আছড়ে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও না। দেবপ্রিয়াকে নিয়ে অমরাবতীর ভীষণ সমস্যা।

একটা কিছু হয়ে পড়লে নরকেও স্থান পাবে না যে সে। ওর দায়িত্ব সমস্ত তার ওপর। সুবর্ণা বোন হাতে তুলে দিয়ে গেছল মৃত্যুর সময়। মেয়ের জন্য চিন্তার অন্ত ছিল না তার।

দূরে কি একটা শব্দ হল। অমরাবতী চমকে উঠল। দেবপ্রিয়াকে দেখা যাচ্ছে না একদম। বাঁদিকে তাকাতে দেখল পাঁচমাথা তালগাছ থেকে ডাল খসে পড়েছে একটা। নিস্তব্ধ রাতে একটু হালকা আওয়াজে ভারী পাথর পড়ার শব্দ শুনেছে। ভেতরটায় হাহাকার উঠেছে কেবল। কিন্তু - কেন?

অমরাবতী চনমন করে তাকাচ্ছে চারদিকে। দেবপ্রিয়া নেই। যতটা সম্ভব পা চালিয়ে—ছোটার মতো চলতে শুরু করল। হাঁফিয়ে পড়ছে, কেন মরতে অল্পক্ষণে চিন্তা করছিল সে। বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখেই কোন অপদেবতা ভর করেছে বুঝি তার মাথায়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। দেবপ্রিয়াকে নজরে পড়েছে। সাদাটে চামড়ার লম্বা ইউকেলিপটাস গাছের তলায় বসে। অমরাবতীর ধড়ে প্রাণ এলো যেন। দুশ্চিন্তার অতলে এমনই ডুবে গেছল যে, আলো-আঁধারিতে চোখে ধাঁধা লেগেছিল।

পাহাড়ের মাংস খুবলে খুবলে পাথরের ব্যাপারীরা মানুষ মারার যে খাদ করে রেখেছে, সেই খাদের তলায় কালনাগিনীর বিষের রঙের কালো জলে অসংখ্য ছায়ার মুখ ভাসতে দেখেছে অমরাবতী। মুখ তুলে তাকাতেই চোখে পড়েনি কিছু। সব ধোঁয়াটে। নির্জন রাতে কল্পনায় গড়া পাগলের চিন্তা পেয়ে বসেছিল অমরাবতীকে। অমরাবতী নিজে জানে নিজেকে ভালো রকম। খুব দুর্বল মনের নয়, ভীতু নয়। অবাস্তব চিন্তাকে নির্বাসন দিয়েছে ভেতর থেকে। তবু সব কটি এক এক করে ঘিরে ধরেছিল তাকে সুযোগ বুঝে পরিবেশ বুঝে। অতীতের নির্মম ঘটনার সিঁড়ি বেয়ে চিন্তার রাজ্যে এসে হাজির হয়েছিল।

মনকে শক্ত করছে অমরাবতী। অতীতের কোন ঘটনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না দেবপ্রিয়ার। দেবপ্রিয়া দেবতার পুজোর ফুল। পবিত্র-

স্বচ্ছ। উনিশে নয়ের মন। যে কোন কারণেই ও এসে থাকুক, ওর কোন বিপদ হবে না।

অমরাবতী চলার গতি কমিয়ে দিয়েছে। পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। খুব বেশি তফাতে নেই দেবপ্রিয়া।

করুণ কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে অমরাবতীর কানে। দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে দেবপ্রিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ছে।

অমরাবতীর বুকের ভেতর যুদ্ধ চলেছে দারুণ। ফুসফুস-হৃৎপিণ্ড মিলে-মিশে দলা পাকিয়ে উঠেছে। কি যে যন্ত্রণা, শত্রুরও যেন এরকম কখনো না হয়। এ আজ নতুন নয়। বহুদিনের পুরনো। রাতদুপুরে এসে এসে, এখানে বসে, এভাবে কাঁদে দেবপ্রিয়া। কার জন্যে কাঁদে ? কিসের জন্যে ?

সদুত্তর কেন—দেবপ্রিয়ার মুখ থেকে কোনদিন এর কোন উত্তর পাওয়া যায় না। যখুনি যে কেউ জিজ্ঞেস করেছে, কেন তুমি আসো এখানে, কেন তুমি কাঁদো—দেবপ্রিয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ ভাবার পর ম্লান মুখে বলেছে, তোমরা কি বলছ, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কেন আসি কেন কাঁদি কিছু জানি না। কই—মনে পড়ে না তো কিছু।

সকলে অবাক। এ কেমন কথা !

রাতে ঘুমের ঘোরে, দেবপ্রিয়া উঠে বসে বিছানায়। চোখ বুজে বুজেই খাট থেকে নামে। ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বারান্দায়। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে। তারপর গেট পেরিয়ে রাস্তায়। চলতে চলতে ঝুরিনামা অশ্বত্থ গাছটার কাছে এসে একটু থামে। আবার চলতে শুরু করে। শেষে ইউকেলিপটাস গাছের তলায় এসে বসে। কাঁদে অনেকক্ষণ ধরে, যতক্ষণ না কেউ দু'কাঁধে হাত রেখে, জোরে জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে সচেতন করে তোলে।

চার বছর বয়স থেকে দেবপ্রিয়া এই করে চলেছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর সুবর্ণার লক্ষ্য পড়েছে এ দিকটায়।

মেয়েকে বুকের ওপর নিয়ে ঘুমুচ্ছে। মাঝরাতে মেয়ে উঠে বসল। দরজার দিকে গেল। বন্ধ দরজায় ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কপাল কেটে রক্তারক্তি। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

মেয়ের কাণ্ডকারখানায় অবাক সুবর্ণা। মেয়ে কি করে দেখা যাক না—কৌতুকের বশে ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে, খুলে দিয়েছে বাইরের গেটও। পেছু পেছু গিয়ে দেখেছে, কোথায় যায়, কি করে।

মিত্রশরণ মারা যাওয়ার পর থেকে দেখেছে বলে, সুবর্ণা ভেবেছিল, বাবা ফিরে আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ফিরে এলো না আর—মেয়েটার লেগেছে বড্ড। জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না, কিন্তু ভেতর-ভেতর গুমরোয় নিশ্চয়।

কোয়ারিতে ব্লাস্ট করার সময় বিপদ এলাকার বাইরে—দড়ি দিয়ে ঘেরা লাল

নিশান পোঁতার বাইরে থেকেও নিয়তির হাত থেকে রেহাই পারনি মিত্রশরণ।

কুশের ছাউনি দেয়া মাটির ঘরের দাওয়ায় বেঞ্চির ওপর মিত্রশরণ বসেছিল। বারো-তেরো বছর ধরে ওখানে বসেই নিজের কোয়ারির পাহাড় ফাটানো দেখে। কিন্তু পরমায়ু ফুরলে, কে রুখবে কাকে! বিপদ এলাকার বাইরেই বা কি, আর ভেতরেই বা কি—ফলাফল একই।

পাহাড়ের গর্তে ঠাসা বারুদে আগুন ধরল। বোমা পড়ার আওয়াজে পাহাড় ফাটল। আকাশ কেঁপে উঠল, মাটিও। পাথর-বৃষ্টি ছুটে এলো মিত্রশরণের বুক লক্ষ্য করে। বেঞ্চি থেকে লুটিয়ে পড়ল মিত্রশরণ রাঙামাটির মেঝেয়।

বাচ্চা মেয়ের কানে এ খবর আসা অসম্ভব নয়। মেয়েটা হয়তো তাই ওই দিকেই যেতে চায়, ওখানে গিয়ে বসে কাঁদে। মেয়ের কান্নায় মাও কেঁদে সারা হয়েছে প্রতিরাতে।

মায়ের ধারণা বদলাল মেয়ে বড় হতে। ছোটবেলায় বলতে না পারুক, বড় হয়ে নির্ভয়ে বলবে মনের কথা। হতাশ হতে হলে সুবর্ণাকে। একই কথা। দেবপ্রিয়া কিচ্ছু জানে না—সে কি করে, না করে।

তবে এ কি কোন ব্যামো?

সুবর্ণা কসুর করেনি ডাক্তারবদ্যি দেখাতে, সাধু-সন্ন্যাসীদেরও দেখিয়েছে অনেক। কিসে ভালো হয় কখন—বলা তো যায় না। ব্যর্থ হল সমস্ত। দেব-প্রিয়া যে-কে সে-ই।

মেয়ের জন্য বুকভরা অশান্তি নিয়ে মৃত্যুপথের যাত্রী হতে হয়েছিল সুবর্ণাকে। মরেও যে সুখ নেই তার। এ মেয়েকে দেখবে কে, বুঝবে কে?

বোন-ভগ্নীপতিকে ডেকে আনিয়ে মেয়ের অভিভাবক করে গেছে। অমরাবতী প্রতিশ্রুতি রেখেছে, রেখে যাচ্ছে। সুবর্ণা বেঁচে থাকতেই চোখে চোখে আগলেছে দেবপ্রিয়াকে। এখনো আগলে যাচ্ছে—রাতদিন। নিজের ছেলেমেয়ের ওপর লক্ষ্য নেই কোন।

অমরাবতীর চোখের কোণ জ্বালা-জ্বালা করছে। জলে ভরে উঠছে দু'-চোখ। চাদরের খুঁট দিয়ে চোখের ভিজে পাতা মুছে নিল। মনে মনে বলল, এ কি কষ্ট ঈশ্বর—এর কি শেষ নেই! মেয়েটা নিশিতে পাওয়ার মতো রাতে ঘুরে বেড়াবে আর কাঁদবে! ওকে শান্তি দাও।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে যেমন অমরাবতী, তেমন অভিমানে-ক্ষোভে ফেটেও পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। আবার নিজের মনে মনেই বলেছে, ঈশ্বর তোমার যদি চোখ বলে কোন জিনিস থাকত, তাহলে মেয়েটাকে এমন নাস্তানাবুদ করতে না। এমন শাস্তি দিতে না। তুমি নেই, তোমার করার কোন ক্ষমতা নেই।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে। এ কান্না পৌঁছুবে না দেবপ্রিয়ার কানে। এ ব্যথার ধাক্কা লাগবে না দেবপ্রিয়ার প্রাণে, এখন ও বধির। এ দুনিয়ার মানুষের প্রাণ নেই ওর।

রাতের অন্ধকারে লাল মাটি ধূসর দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না আর। পাথর-মাটির ওপর বসে পড়ল ধপাস করে। পাশে খাদ। মাটির ওপর থেকে নিচে—অনেক নিচে। একতলা দোতলা তিনতলা—ছ'তলা সাত-তলা আটতলা।

পাতালের ঘন অন্ধকার দেবপ্রিয়ার জীবনকে ঘিরে রেখেছে ছোট থেকে। হতভাগিনী কোনদিন আলোর মুখ দেখতে পাবে না বোধহয় আর। নিজে নিজেই অস্ফুটে বলে উঠল অমরাবতী, না, না। পাবে নিশ্চয়। পেয়েছে তো।

অমরাবতী অন্ধকারে আলোর ঝিলিক দেখল। সেই ঝিলিকে একটা মুখই ফুটে উঠল। ইন্দ্রনাথের।

ইন্দ্রনাথ ওদের বাড়িতে আসার দিন থেকে যে ঘটনা নিত্য ঘটেছে, সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়নি আর। এ যেন কোন যাদুবলে বা মন্ত্রশক্তিতে অঘটন ঘটে গেল। অকাতরে ঘুমিয়েছে দেবপ্রিয়া রাতভোর।

সামনের খাটে অমরাবতী জেগে বসে থাকে। বসেছিল। দু'চোখ দেব-প্রিয়ার ওপর। দেবপ্রিয়া যে সময় ওঠে, উঠল না। ঘুম-চোখে বেরিয়েও গেল না ঘর থেকে। মেয়ের কাছে উঠে এসে এসে দেখেছে মাসী। শরীর খারাপ হয়নি তো! মেয়েটা এমনিতেই চাপা। সাত চড়ে রা করে না। খুব চাপা। বলেনি হয়তো মাসী ভাববে বলে।

কপালে হাত দিয়ে দেখেছে, গরম নয়, ঠাণ্ডা। নাকের কাছে আঙুল ধরেছে, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। ঘুমুচ্ছেই, অজ্ঞান হয়ে যায়নি! তবুও মৃদু গলায় আস্তে আস্তে ডেকেছে। সাড়া পায়নি। সন্দেহের অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু হচ্ছে না। যে জিনিস রুখতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে অনবরত, হঠাৎই আপনা হতে রুখে গেল। সত্যি-সত্যি, না মনের ভুল?

সারারাত গালে হাত দিয়ে, একভাবে মূর্তির মতো বসে থেকেছে খাটে অমরাবতী। দৃষ্টি দেবপ্রিয়ার মুখের ওপর। বিষণ্ণ কাতর নয় আজ, লাবণ্য মাখানো সুশ্রী-সুন্দর।

ভোরের স্নিগ্ধ আলো এসে দেবপ্রিয়ার মুখে পড়ছে। বাইরে গেটের মাথায় জড়ানো লতানে যূঁইফুল গাছটার মোটা ডালে বসে আছে পাপিয়া পাখি। মন-জুড়নো প্রাণ কেড়ে নেয়া গলায় কাকে বুঝি ডাকছে ও।

অমরাবতী বেরিয়ে এলো বারান্দায়। দাঁড়িয়ে রইল খানিক। পুবের আকাশে গোলাপী-সোনালীর ছোপ ধরেছে। মনের শূন্য জায়গাটা ভরে উঠছে আনন্দে, পাখিটা উড়ে যেতে চমকে উঠল। এ আনন্দ ভরভরতি হয়ে থাকবে তো? উবে না গিয়ে, আবার শূন্য হয়ে না যায় সব!

ঘরের ভেতরে এসে দেয়ালে ঝোলানো গণেশের ছবিতে মাথা ঠেকিয়ে বলল, এই রকম আর কোন রাত্তিরে যেন দেবপ্রিয়া না বেরোয়।

বেরোয়নি মাস ছয়েক! আবার বেরিয়েছে। দু'দিন হল বেরোচ্ছে।

ইন্দ্রনাথও দু'দিন নেই পাকুড়ে। বাইরে কোথায় গেছে, কিছু বলে যায়নি।

এ এক মস্ত রহস্য। ইন্দ্রনাথ থাকলে রাতে ঘুমুবে, না থাকলে, আগের ব্যামো আসবে ফিরে। এটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে অমরাবতী। দেবপ্রিয়াকে জিজ্ঞেস করেছে, এতদিন বেরোসনি তো আবার বেরোচ্ছিস কেন? একই— সেই আগের উত্তর—কিছু জানি না।

ইন্দ্রনাথের জন্যেই কি দেবপ্রিয়ার মন খারাপ? নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে অমরাবতী নিজেই।—তা কেন হবে? ইন্দ্রনাথ আসার আগে থেকেই তো ও এমন। যাই হোক, ইন্দ্রনাথ পয়মন্ত।

হঠাৎ অমরাবতীর মনে হল, দুশ্চিন্তার বোঝাটা মাথা থেকে কে যেন টেনে তুলে নিচ্ছে। মাথাটা হালকা হয়ে আসছে। ইন্দ্রনাথের মিষ্টি মুখ ঘোরাফেরা করছে দু'চোখে। ছেলেটা বড্ড মিশুকে, খুব ভদ্র। দেবপ্রিয়াও অপছন্দ হওয়ার মেয়ে নয়। দুজনের চোখাচোখি হলেই, খুশির আমেজ ছড়িয়ে পড়ে মুখে। অচেনা লোক এসে পড়লেও, নজর এড়াবে না। এক-আধদিন নয়, ছ'মাস একনাগাড়ে ভালো থাকা কম ভাগ্যের কথা নয়। যে কারণেই হোক, ও আসার পর মেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, ও চলে যেতেই আবার অস্বাভাবিক।

ওকে কি আটকানো যায় না? স্বজাতি, গোত্র আলাদা। কোন বাধার গণ্ডী নেই। হয়তো বিধাতার নিয়ম এইটা। তা না হলে ব্যবসা করতে এখানে এসে পড়ল কেন? মেয়েটার দুর্গতি ভোগ কাটবে বোধ হয়।

অমরাবতী মনে মনে হাসল। প্রথম থেকেই ইন্দ্রনাথ বাড়ির সকলকে আপন করে নিয়েছে।

যারা দেখেছে, দেখে, বেড়িয়ে গেছে পাকুড় থেকে, তারাই ইন্দ্রনাথের কাছে কথা তুলেছে, পাথরখনি ইজারা নিলে, ঘরে দু'পয়সা আসবে।

সেই থেকে আসার ঝোঁক ইন্দ্রনাথের। পয়সা বেশি আসুক এটা বড় কথা নয়। বড় কথা একটা পথ পাওয়া। কিসের ব্যবসা করা যায় এই চিন্তায় হন্যে হয়ে ঘুরে মরছিল এলাহাবাদের আনাচেকানাচে অবধি। কোন ব্যবসাই পছন্দ নয়, কিছুই স্থির করতে পারেনি। পাথরখনির কথা শোনার পর মনে হল, কেন এই ব্যবসা করতে তার মন চাইছিল। সে বুঝতে পারছিল না।

এলো পাকুড়ে।

দু'চারটে পাথরখনি দেখাবার পর সুবর্ণা স্টোনচিপ সাপ্লাইয়ে এসে হাজির। কোয়ারি দেবপ্রিয়ার মায়ের নামে। চালায় মেসোমশাই। উশীনর।

উশীনর তো উশীনরই। একেবারে পুরাণের সেই ন্যায়বাগীশ মানুষ। ন্যায়ের বিচারে যে একটা পায়রাকে আশ্রয় দিয়ে, ওকে শ্যেনপাখীর মুখ থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত হয়েছিল। এতটুকু দ্বিধা-বোধ করেনি।

প্রথম দেখা করতে এসে, বিস্ময়ের চোখে যা দেখল ইন্দ্রনাথ, মনে দাগ কেটে বসে গেল। পুরাণ পড়ে অনেক কথা বিশ্বাস হয় না। আজগুবি মনে হয়। কিন্তু বাস্তবেও যে পুরাণের চরিত্র জীবন্ত হয়েও ঘোরাফেরা করে, উশীনরকে দেখে ইন্দ্রনাথের নতুন অভিজ্ঞতা হল।

মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য কি জেদাজেদি লোটনের। কারো কথা শুনবে না, কারো বাধা মানবে না। সাত বছরের ছেলের বিক্রম কি!

টুকরি ভর্তি পাথর-টুকরো মায়ের মাথায়। খাদের তলা থেকে উঠছে। উতরাই থেকে পাহাড়ের চড়াইয়ে উঠছে। লোটনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে মা ছেলে দুজনেই পড়ে গেল। গড়াতে গড়াতে নিচে।

পড়ার সময় এক করুণ দৃশ্য। নিজের কি হবে—সেদিকে খেয়াল নেই মায়ের। গড়াতে গড়াতেই হাত বাড়াচ্ছে ছেলেকে ধরার জন্য। কেউ কাউকে ধরতে পারল না। নাগালের বাইরে। ছেলেও হাত বাড়িয়েছিল।

মা-ছেলের মাথা ফাটল। রক্তগঙ্গা। বাড়িতে এনে তুলল উশীনর ওদের। সঙ্গে এসেছে ইন্দ্রনাথ। নিজেকে অপয়া মনে হয়েছে। সে আসার জন্যই হল এসব—বলেছে উশীনরকে।

মৃদু হেসে উশীনর বলল, মন খারাপ করার কি আছে! এ ঘটনা তো আকছার ঘটছে এখানে। উশীনর হাত চাপড়াল ইন্দ্রনাথের পিঠে। ইন্দ্রনাথ দেখেছে, মানুষটার একরাশ চোখের জল টলটল করছে। ডাক্তারের কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, ছেলেটা তো বড্ড ক্ষীণজীবী। এত রক্ত বেরোল, রক্ত না দিলে বাঁচবে কি করে?

উশীনরের দিকে চেয়ে একটু হাসল ডাক্তার। বলল, অনেকবারই তো অনেক দিচ্ছেন, এরকম করলে আপনি ক'দিন বাঁচবেন? বয়স বাড়ছে বই কমছে না তো আর।—আপনি কিছু ভাববেন না।

আমি তৈরী। একটু-আধটু রক্ত গেলে আমার কিছু হবে না। লোটন একটাই ছেলে, বাপটা তো কাজকর্ম কিছু করে না। খালি হাঁড়িয়া গিলছে আর নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। পাথর ভেঙে মা ক' পয়সাই বা পায়! ছেলেটাই ওর ভবিষ্যৎ।

শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এলো ইন্দ্রনাথের। একজন প্রৌঢ় কি ভাবে এগোচ্ছে, আর সে—একটা চব্বিশ-পঁচিশ বছরের জওয়ান। দাঁড়িয়ে দেখছে, সহানুভূতি প্রকাশ করছে, মর্মযাতনা অনুভব করছে। এইতেই মানবতার কর্তব্য সব শেষ। উশীনরের কথাটা তার মুখ দিয়েই বেরোনা উচিত ছিল।

ইন্দ্রনাথের কত ছোট মনে হচ্ছে নিজেকে। লজ্জায় কুঁকড়ে যাচ্ছে। পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হলে সীতার মতন লুকিয়ে বাঁচে।

দেবপ্রিয়া ঘরে ঢুকল।

—মেসোমণি! বারণ শুনবে না তো তুমি?

—তোকে আবার কে খবর দিল? থতমত খেয়ে বলল উশীনর।

—খবর হাওয়ায় ভাসে। তোমার হীরা সিং। সে এখানে দাঁড়িয়েছিল। তোমার কি আর কোন দিকে কোন খেয়াল আছে নাকি?

হীরা সিংয়ের মা-বাবা নেই। পাথরখনির কাজ করতে করতে জীবন খুইয়েছে দুজনে। হীরা সিংকে এই বাড়িতে এনে তুলেছে উশীনর। এই বাড়িরই ছেলে হয়ে গেছে সে।

মুচকে হেসে উশীনর বলল, দেখছি দুষ্টুটাকে। তুই যা মা। আমি কিছু করবো না।

—রক্তের দরকার হলে আমি দেব'খন।

দেবপ্রিয়ার কথায় আচমকা একটা ধাক্কা খেল ইন্দ্রনাথ। ওর পিঠে যেন চাবুকের ঘা বসিয়ে দিল দেবপ্রিয়া সপাং করে।

সিধে হয়ে দাঁড়াল, মুখ তুলল। স্পষ্ট গলায় বলল উশীনরের দিকে তাকিয়ে, যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলছি, আমার রক্ত নিতে পারেন।

কথাটা ঠেলে বেরিয়ে এলো ইন্দ্রনাথের ভেতর থেকে।

মেসোমণির সঙ্গে অনেকেই বাড়িতে আসে। কে আসে, না আসে, অত লক্ষ্য করে না দেবপ্রিয়া। এবারেও দেখেনি, ঘরের মধ্যে কে আছে না আছে। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। মেসোমণির রক্ত দেয়া বন্ধ করতে হবে। স্বীকার করুক না করুক, মেসোমণির শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। অচেনা-অজানা যুবক কণ্ঠস্বরে রক্ত দেওয়ার আগ্রহ শুনে, তাকাল ইন্দ্রনাথের দিকে।

চোখাচোখি হল দুজনের।

পুরনো ঘর পুরনো পরিবেশ, তবু দেবপ্রিয়ার কাছে কিরকম যেন আশ্চর্য ঠেকতে লাগল সব। নিজেকেও। ইন্দ্রনাথকে দেখছে অপলক চোখে।

অপর কেউ ঘরে এসে পড়লে, দৃশ্য দেখে, দুজনকেই বেহায়া-নির্লজ্জ ভাবত নির্দ্বিধায়। চুম্বকের আকর্ষণের মতো ইন্দ্রনাথের চোখ দেবপ্রিয়ার চোখে আর দেবপ্রিয়ার চোখ ইন্দ্রনাথের চোখে আটকে রয়েছে।

দেবপ্রিয়া তাকাতে পারছে না আর, একটা অন্ধকার পরদা নামছে ধীরে ধীরে দু'চোখের সামনে। পরদাটা দু'হাত দিয়ে সরানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল বার দুয়েক। পারল না। আরো ভারী হয়ে, আরো ঘন হয়ে নামছে। বুকে পাঁজরা থেকে পাথর কেটে বার করার মতো শাবলের ঘা মারছে কে। হাড়-পাঁজরা-ফুসফুস-হৃৎপিণ্ড সব টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। সর্বশরীর কাঁপছে। হাত বাড়িয়ে অবলম্বন খুঁজল। কিছু ধরার জন্য। পেল না।

সবার অলক্ষ্যে পড়ে গেল ধড়াস করে।

জ্ঞান হতে দেখেছে, দোতলার ঘরে। ডাক্তার কপালে হাত দিয়ে বলল, নাথিং। রক্ত দেখে ঘাবড়ে গেছে। তোমাকে ভাবতুম শক্ত মেয়ে, ছিঃ ছিঃ—

এত দুর্বল তুমি !

উঠে বসতে যাচ্ছে দেবপ্রিয়া, হাতের ইশারায় বারণ করল ডাক্তার। বলল না, না। কমপ্লিট রেস্ট। মনের ওপরে ধকল পড়েছে বেশ খানিক।

বিড়ম্বনার একশেষ, বিব্রত মুখ করে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ। মন খুব খারাপ দু'দুটো কাণ্ড ঘটল। উশীনর নিখাদ ভালো মানুষ। কোয়ারিতে আলাপের সময় নিজের লোক হয়ে উঠল এমন যে, ওর অনুরোধকে আদেশ হিসেবে শিরোধার্য করেছে ইন্দ্রনাথ।

উশীনর বলেছে, আমার দ্বারা যেটুকু হতে পারে, প্রাণপণ চেষ্টা করবো আমাদের একটা জমি তো পড়ে আছে এমনি। ওইটাই ইজারা দিয়ে দেবখ'ন। দেখ বাবা, তুমি আমার ছেলের বয়সী। আপনি-আপনি বলতে মুখে বাধছে। তুমি বলছি, মনে করো না কিছু।

ইন্দ্রনাথের মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। খপ করে দু'পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আপনি আমার বাবার চেয়েও বড়। এতক্ষণ আমারই 'তুমি' বলতে বলা উচিত ছিল।

উশীনর বলেছে, হোটেলে উঠেছ কেন? আমার বাড়িতে তো জায়গা অঢেল। ঘরও অনেক। তুমি থাকো না। থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে নাও। পরে নিজের ডেরা করে নেবে। বাসা নয়, বাড়ি তৈরী করবে গো।

থেলোহুঁকোয় মুখ লাগিয়ে একটা টান দিতে শুরু করল উশীনর। মুখের ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে দিয়ে বলল, এটা কলকাতার এক বাঙালী বন্ধু বেড়াতে এসে দিয়ে গেছে। যে যেখান থেকে আসে, ব্যবসার জন্যই হোক আর বেড়ানোর জন্যই হোক আমার গরীবখানায় দয়া করে পায়ের ধুলো দেয় সবাই।

—ওরকম করে বলবেন না আমায়। শরম-জড়ানো গলায় বলল ইন্দ্রনাথ।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষুণে ঘটনা। লোটন আর তার মায়ের রক্তপাত। ডাক্তারদের দৌলতে প্রথম পর্ব সামলানো গেল বটে কিন্তু দ্বিতীয় পর্ব?

—চেয়ারটা যে খালি কাঁদছে বাবা। বসো না। তোমার অত ভাবনা কেন? সংসারক্ষেত্রে কত রকম ঘটনা ঘটবে, এতে কি অত চঞ্চল হয়ে পড়লে চলে বাবা!

ইন্দ্রনাথ আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মনটা এমন সহানুভূতিতে পূর্ণ যে, মুখ দেখে মন বোঝে। বাড়ির মেয়ে আচমকা এমন হয়ে পড়ল— ইন্দ্রনাথ মনমরা হয়ে পড়েছিল সত্যিসত্যিই। উশীনর ইন্দ্রনাথকে চিনেছে ঠিক।

ছোটবেলা থেকে ইন্দ্রনাথের স্বভাব একটু অন্য ধরনের। কারো কোন খারাপ হলে, সে সময় ও যদি সেখানে উপস্থিত থেকেছে, ভেবেছে, ওর জন্যই খারাপ হল। এমন বদ্ধমূল ধারণা, এটা ঠিক নয়, হাজারো বার বুঝিয়েও মন থেকে সরাতে পারেনি কেউ। এখনো তাই। পঁচিশেও পনেরোর মন। এর জন্য মানসিক কষ্ট পেয়েছে, পাচ্ছেও। চেয়ারে বসল ইন্দ্রনাথ।

ডাক্তার বেরিয়ে গেছে কখন ঘর থেকে। অমরাবতী দেবীপ্রিয়ার ঘরে বসে। আলগা চুল আলতোভাবে নাড়ছে-চাড়ছে। খাটের সামনের চেয়ারটায় বসে দেবপ্রিয়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে উশীনর।

দেবীপ্রিয়া আগের মনে আগের শরীরে ফিরে এসেছে। দু'চোখ চক্কর দিয়ে এলো একবার গোটা ঘরটায়।

ইন্দ্রনাথ অস্বস্তি ভোগ করছে। এদের মধ্যে তাকে বেমানান। নিচের ঘরেই দাঁড়িয়েছিল, হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে এল উশীনর।—আরে পরের মতো একলা থাকবে কেন নিচে? অবাক করলে! ঘরের ছেলে। ওপরে চলে আমাদের সঙ্গে। অমরাবতীকে দেখিয়ে বলেছে, ইনি আমার সহধর্মিণী, এ বাড়ির সকলের—ছোট বড়র মাসীমণি। তোমারও।

অমরাবতী বলেছে, দিন দিন তোমার কথাবার্তার যা ছিরিছাঁদ দাঁড়াচ্ছে, লোকে পাগল না ঠাওরায়। হাসিমুখে ফিরেছে ইন্দ্রনাথেব দিকে। কোথায় বাড়ি বাবা তোমাদের?

—এলাহাবাদে পাণ্ডেদের বাড়ি।

—ওমা! তাই তো বলি, চেহারাতেই মালুম হচ্ছে। বলেছি বামুনের ছাপ! আমাদেরও আদি বাড়ি কাশীতে। আমরা কাশ্যপ। এসো বাবা এস। ঘরে ডেকে নিয়ে গেছে অমরাবতী।

পরিচয় শোনেনি দেবীপ্রিয়া।

অমরাবতীর চোখে নিজের চোখের প্রশ্ন তুলে ধরেছে নীরব ভাষায়।—দেওয়ালের দিকে চেয়ারে বসে কে?

অমরাবতী হাসতে হাসতে বলল, ও ইন্দ্রনাথ, আমাদের অতিথি। স্টোন-চিপের ব্যবসা করবে বলে এসেছে এখানে।

ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরল। বলল, এ আমার বোনঝি—দেবীপ্রিয়া।

ইন্দ্রনাথ জোড়হাত করে নমস্কার জানাল।

দেবীপ্রিয়াও দু'হাত কপালে ঠেকাল। প্রতিনমস্কার।

চোখ নামিয়ে মুখ নিচু করে বসে রইল ইন্দ্রনাথ। বুকের ভেতরে ভয়ে ধুকপুক করছে। চাইলে যদি আবার নিচের মতো হয়। চাইতে ইচ্ছে করছে। অতিকষ্টে সংযত করে রাখছে নিজেকে। বারান্দার দিকে চোখ ঘোরাল। ধু-ধু প্রান্তর। লালমাটির বুকে রোদ্দুর চিকচিক করছে। জল টলমল করছে যেন। দূর থেকে এই ভ্রমটাই হয় বেশি। ইন্দ্রনাথ ওখান দিয়ে এসেছে। ছিটেফোঁটাও জল নেই। শক্ত পাথরমাটি। এদিকে ওদিকে ছড়ানো ছিটনো ঘাসের চাপড়া। ফিকে সবুজ।

এইভাবে কতক্ষণই বা বসে থাকা যায়? ঘর থেকে বেরোনোর জন্য ছটফট করছে ইন্দ্রনাথ ভেতরে ভেতরে।

বিপদভঞ্জন উশীনর বিপদ-মুক্ত করল। অমরাবতীকে বলল, বোটনকে দেখে

আসি একবার। ইন্দ্রনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। বলল, চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে গিয়ে একটু দেখে আসি। ইন্দ্রনাথ উশীনরের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে। অমরাবতী বলল, দুটো গল্প করবো, তা না চলে যাচ্ছে। কি লাজুক ছেলে রে বাবা !

'লাজুক'। কানে বাজছে দেবপ্রিয়ার। আবার শাবলের ঘা বুকে পড়ছে। আবার সেই অসহ্য যন্ত্রণা। মাথার বালিশে মুখ গুঁজে, ঘুরে শুলো বুক চেপে।

অমরাবতী অস্থির হয়ে পড়ল।—রুপা, রুপা ! কি কষ্ট হচ্ছে বল না। লক্ষ্মী মা। দেবপ্রিয়া জবাব দিল না। কথা কইতে পারছে না। চোখ চাইতে বোজা চোখের কোণ বেয়ে জল গড়াচ্ছে।

আঁচল খুলে মুছিয়ে দিচ্ছে অমরাবতী। কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে নিজের। রূপ অর্থ বিদ্যা, কিনা নেই। তবু কি কষ্ট কেউ জানে না। বলতে পারে না বাছা। সব থেকেও সব নেই, এ যে সুখের ঘরে কাঁটা বিছানো !

মাসখানেক ইন্দ্রনাথ অনেক সহজ হয়ে এসেছে।

সহজ হওয়ার মূল কারণ লোটন। কণ্টিপাথরে খোদাই সাঁওতাল ছেলেটা দুজনের প্রাণ হয়ে দাঁড়াল।

ভরদুপুরে একখানা ইংরিজি নভেল নিয়ে দেবপ্রিয়া পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে। পড়ছে না, পড়তে ইচ্ছে করছে না। ছেলেমানুষি করছে স্রেফ। বুঝতে পারছে। তবুও ভেতরের অস্থির-অস্থির ভাবটা যাচ্ছে না মোটে। আরো বেড়ে উঠছে।

আচমকা মনে হল, লোটনের টেবিলে মাত্র এক গেলাস জল, তেষ্টায় খেয়ে ফেলেছে হয়তো। আবার তেষ্টা পেয়েছে।

পড়িমরি করে নামল সিঁড়ি বেয়ে। ঘরে এলো। অসহায় চোখে চেয়ে আছে লোটন। গেলাসে জল নেই। দেবপ্রিয়া গেলাস ভরে দিল কুঁজোর জল।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল ইন্দ্রনাথ। কোয়ারিতে কাজ দেখতে দেখতে কেবলি মনে হচ্ছিল, লোটনের গেলাস খালি, জল নেই। ওর গলা শুকিয়ে কাঠ।

—এ সময়ে আপনি ? দেবপ্রিয়া জিজ্ঞেস করল ইন্দ্রনাথকে।

—আমারও তো ওই একই প্রশ্ন—আপনি ?

জলের গেলাসের দিকে তাকাল দেবপ্রিয়া।

—ওই জন্য আমারও আসা।

শুধু এ ব্যাপারই নয়, আরো ঘটেছে।

রাত্তিরে ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে পড়ল দেবপ্রিয়া। অমরাবতী তো তরাসে নেমে পড়ল খাট থেকে। উপস্থিত ঘুমন্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়া অসুখটা দেখা যাচ্ছে না বটে, ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়—রাত্তিরে দেবপ্রিয়া ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উঠে বসতে—অমরাবতীর সেই অবস্থা।

দেবপ্রিয়াকে অনুসরণ করল।

লোটনের ঘরে দেবপ্রিয়া প্রবেশ করল, উঁকি মেরে দেখেই দরজার পাশে সরে দাঁড়াল অমরাবতী।

ঘরের ভেতর লোটনের মাথার কাছে ইন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে। ঘুমের ওষুধ খাওয়াচ্ছে।

দেবপ্রিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ঘুম-ঘুম গলায় ইন্দ্রনাথ বলল, চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, খাওয়া হয়ে যাওয়ার পর, ঘুমের ট্যাবলেটটা দেয়া হয়নি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে পড়ে গেল। ছেলেটা না ঘুমিয়ে কষ্ট পাচ্ছে। ট্যাবলেটটা দিয়ে আসি।

—আমারও ঘুম ভেঙে মনে পড়ল। যেদিন একা ঘরে মাকে দেখার জন্য কেঁদে সারা হচ্ছিল লোটন, সেদিনেও দুজনের মনে ধাক্কা দিয়েছে কান্নার বেদনা।

কোয়ারিতে পাহাড় ফাটানো দেখছিল দেবপ্রিয়া। বাজারের দিকে গেছল ইন্দ্রনাথ ব্যবসার খাতিরে। দেখল, ছেলেটা কেঁদে কেঁদে দু'চোখ লাল করে ফেলেছে। খদ্দেরদের সঙ্গে কথায় মন বসছে না। মন ছুটছে বাড়ির দিকে। ইন্দ্রনাথ ইচ্ছের লাগাম টেনে রাখতে পারছে না।

ছেলেটার স্নেহমাখা চোখদুটো এমন যে, তার ভেতরের সমস্ত স্নেহটুকু নিংড়ে বার করে না নিয়ে, ছাড়বে না তাকে। ছাড়বে পাথরমাটির মতো তার ভেতরটা শুকনো খটখটে করে। কি সাংঘাতিক ছেলেরে বাবা! নিজের দিকে মনটা টেনে রেখেছে কেবল। ধরে রেখেছে শক্ত মুঠোয়।

টাঙায় উঠে বসল। গাড়ি চলছে, বড় রাস্তা পেরোচ্ছে, ইন্দ্রনাথের তর সইছে না। চৌদ্দ-পনেরো বছরের কিশোর সইসটাকে বলল, চাবুক মেরে ঘোড়াটার পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দে তো। অকেজো কোথাকার। রাগে গস গস করেছে বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত। বারুদ ঠাসা হয়েছে পাহাড়-কাটা গর্তের মধ্যে। আগুন ধরানোর মুখে দেবপ্রিয়া আনমনা হয়ে পড়ল। সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজার আওয়াজে লোটনের কান্না শুনছে। বুকফাটা কান্না! দেবপ্রিয়ার বুকের তলায়ও কান্না গুমরে উঠছে। এই ছেলেটাকে না দেখলে, থাকতে পারে না সে। তার মাথা কিনে রেখেছে যেন! দিবারাত্রি ওর ধ্যানজ্ঞান করতে পারে না আর দেবপ্রিয়া।

দুপুরের আগুন-জ্বালা রোদ্দুর মাথায় করে দৌড়ে এসেছে বাড়িতে। লোটনের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে পা মুড়ে বসেছে খাটিয়ায়। এলো ইন্দ্রনাথ। রোদ্দুরে মুখখানা তেতে আগুন। রক্তবর্ণ। বলল, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটোকে করমচা করে ফেলেছিস যে!

লোটনকে ভালোবেসে দুজন দুজনের খুব কাছাকাছি এসে গেছে। লোটনকে ভালোবেসেই একজন আর একজনকে ভালোবেসে ফেলেছে নিজের অগোচরেই।

ইন্দ্রনাথ দেবপ্রিয়াকে, দেবপ্রিয়া ইন্দ্রনাথকে।

পাথরখাদির খাদের পাশ দিয়ে বেড়াচ্ছে দুজনে। মধ্যিখানে লোটন। লোটনের বাঁ হাতটা ধরেছে দেবপ্রিয়া, ডান হাত ইন্দ্রনাথ। দুষ্টু ছেলে এর মুখের দিকে একবার আর ওর মুখের দিকে একবার চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে। মিটমিট করে হাসছে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদের তাপ নেই। সূর্য পশ্চিমে ঢলেছে। লাল রঙটা কেটে গেছে। হলুদ রঙের আস্ত চাঁদ একখানা। মিঠে বাতাসে ঠান্ডা আমেজ। কুলিকামিনদের ছুটি হয়ে গেছে। ঘরমুখো সবাই। দুধখেকো বাচ্চা পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েরা। বুনো ফুল চুলে গোঁজা।

দেবপ্রিয়াও ফুল গুঁজছে এলো-খোঁপায়। তবে, বুনো ফুল নয়, চাঁপা। চাঁপার উগ্র গন্ধটা ভালো লাগে। শাড়ি-ব্লাউজ চাঁপা রঙের। মায় সরু জরি লাগানো চটিটাও চাঁপা রঙের ভেলভেটের। দেবপ্রিয়া সাজতে গুজতে ভালো-বাসে বরাবরই।

মন্দিরের গায়ে লাগানো মূর্তির সাজসজ্জা ওর ভারী পছন্দ। বাড়িতে যখন থাকে, এক একদিন এক এক রকম সাজে।

ইন্দ্রনাথের সাদাসিধে সাজ। পরনে সাদা পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবি। পায়ে নাগরা। লোটনের হাফপ্যান্ট শার্ট বুটজুতো। সুতির সাদা মোজা।

বেড়াতে বেড়াতে ওরা কোয়ারিতে এলো। মাটির দেওয়াল আর কুশের ছাউনির ঘরটার লাল দাওয়ায় এসে বসল তিনজনে পা ঝুলিয়ে। ঘরটা উঁচুতে। পাহাড় ফাটানো দেখার জন্যেই ওই ভাবে তৈরী। ব্লাস্ট করার সময় পাথর ছিটকনোর মোটামুটি একটা মাপ আছে। সেই মাপের বাইরেই বসানো হয়েছে ঘরটাকে।

এই কোয়ারি এখন এক মূর্তি। আর সকালের দিকে? শিবের তাণ্ডব নৃত্য চলে এখানে। পাহাড় ভেঙে খান খান। গর্জনতর্জন। পাথর ভাঙা-ভাঙির হম্বিতম্বি। প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি জীবনযাত্রা শুরু করে মানুষ। উনিশবিশ হলে, পা পেছলালে, অন্তিম মুহূর্ত আসে ঘনিয়ে। খাদের ওপর দিয়ে বাতাস বইছে। অপঘাতের দীর্ঘশ্বাস।

দেবপ্রিয়া এই দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শ পাচ্ছে নিজের নিশ্বাসে। অতৃপ্ত আত্মার যাতনা আশা-আকাঙ্ক্ষা অভিশাপ—সব ছড়িয়ে আছে জায়গাটায়! পাতাল-পুরীর শিরা-উপশিরা থেকে মাটির থামটি অবধি। পাহাড়ের ফাটলে, নীরেট পাথরে খাদের অতলে কুলিকামিনদের জমাট হতাশা থরে থরে সাজানো।

জায়গাটা পছন্দ নয় দেবপ্রিয়ার। তবু আসে তবু আসে। মনে হয়, মাটির তলার পাহাড় খাদ আর সে অভিন্ন। এখানে যত দুর্ঘটনা ঘটেছে, যত আশা পুড়ে ছাই হয়েছে—সমস্ত তারই বুকের ওপর।

দেবীপ্রিয়া পাহাড়-খাদ থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখতে চায়, আলাদা করে ভাবতে চায়, কিন্তু তা বুঝি হওয়ার নয়। পারে না! নিজেকে সরাতে গিয়ে আরো জড়িয়ে পড়ে।

বান্ধবীরা বলে, তুই বড় দুঃখবিলাসী। প্রকৃত যারা দুঃখী, দুঃখ পেয়ে পেয়ে, দুঃখ ভোগের অনুভূতি থাকে না, বুঝলি? তোর এত মাথা ব্যথা কেন —কাজ করতে করতে কে মরছে, কে বাঁচছে? অদৃষ্টে দুঃখভোগ থাকলে, খণ্ডাবে কে! মনগড়া দুঃখ নিয়ে হা-হুতাশ করতে হবে। সুখ সবার সয় না যে।

দেবীপ্রিয়া কি সত্যিই দুঃখবিলাসী? ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করল, এখানটা কেমন লাগে আপনার?

ইন্দ্রনাথ বুঝতে পারেনি পাথরখনির কথা জিজ্ঞেস করছে দেবীপ্রিয়া। ভাবল, দেবীপ্রিয়া নিজেদের কথা আর দেশটার কথা জানতে চাইতে। দুটোর সম্পর্কে তার মনোভাব কি। ইন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাস আবেগ বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে লাগল বাইরে। বলল, আমার ঠিক মনোমত। এ ব্যবসা আমার ভালো লাগছে, এখানকার লোক আমার ভালো লাগে। মাসীমণি মেসোমণির তো তুলনা হয় না। আর সামনে বললে—

বাকিটা বলা আর হল না ইন্দ্রনাথের। দেবীপ্রিয়া বাধা দিল, বলল, এই পাহাড়ে কত লোক মরছে, মরেছে—আপনিও তো স্বচক্ষে কিছু কিছু দেখছেন। ভালো লাগছে?

ইন্দ্রনাথ অপ্রস্তুতে পড়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে, আমতা আমতা করে বলল, মৃত্যু-জন্ম কি আমাদের হাতে? করার কিছু কি আছে?

—করার নেই বলে, মনটাও থাকবে না? মনে লাগবে না কারো?

কি উত্তর দেবে ইন্দ্রনাথ? ভেবে পাচ্ছে না। মহাফাঁপরে পড়েছে। তিন চার মাসে দেবীপ্রিয়াকে বুঝতে বাকি নেই তার। দেবীপ্রিয়া স্পর্শকাতর। স্পর্শ-কাতর মানুষ অনেকেই আছে, ও কিন্তু বড্ড বেশি। দেহটা ওর বাস্তবের হলে কি হবে, মনটা তো অবাস্তব রাজ্যে ঘোরে সর্বক্ষণ। দয়া মমতা যথেষ্ট আছে, যা অন্য মেয়ের মধ্যে মেলা ভার। তা বলে, যারা চলে গেছে, যারা চলে যাচ্ছে, এ পৃথিবীতে ফিরে আসার কোন উপায় নেই আর, তাদের নিয়ে দিনরাত চিন্তা করলে মানুষ পাগল হয়ে যাবে যে। বলল, অতীত তো ফিরে আসে না কখনো, তাকে নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো। মিছিমিছি নিজেকে কষ্ট দেয়া স্রেফ।

ইন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনিই শোনা গেল দেবীপ্রিয়ার মৃদু স্বরে।—অতীত আসে না···মাথা না ঘামানোই···নিজেকে কষ্ট দেয়া—

কথা নয় তো—এ যে অন্তরের কান্না। না বুঝেসুঝে, মনকে ঘোরানোর উদ্দেশ্য—দেবীপ্রিয়াকে শান্তি দিতে গিয়ে একি বলে বসল? সত্যিসত্যিই এটা তার প্রাণের কথা নয়। দেবীপ্রিয়ার মতোই মন তার। অবিকল। সময় সময়

ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয়, নিজেই বলছে, প্রকাশ করছে নিজের মনোভাব।

ইন্দ্রনাথের দেবপ্রিয়াকে এত পছন্দ এই একটি মাত্র কারণে।

মমতার উঁচু সুরে বাঁধা মিহি তারের অনুভূতিকে ছিঁড়ে ফেলল ইন্দ্রনাথ নির্দয় কথার টানে।

আপসোসের অন্ত নেই। সে দোষী। দেবপ্রিয়ার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। আড়চোখে দেখল। ফর্সা মুখ বিষণ্ণ। ছলছলে চোখ। ঠোঁট নড়ছে, কথা নেই। মনে মনে বলছে বোধ হয়।

দেবপ্রিয়া আশা করতে পারেনি, এই মানুষের মুখ দিয়ে এই কথা বেরোবে। প্রশ্নের আগে উত্তরটা ঠিক করেই রেখেছিল সে। বলবে, এখানের অপঘাত মৃত্যু সহ্য করতে পারি না আমি। তা বলল না। বলল পাষাণ বুকের কথা।

যা ভেবেছিল তা যদি বলত ইন্দ্রনাথ, বান্ধবীদের কাছে 'দুঃখবিলাসী' নামটা মুছে যেত, তার বান্ধবীরা জানত, সে যেটা ভাবে, সেটা বেঠিক নয়। অন্যজনও সমর্থন করে।

বান্ধবীরা তার নামের বিশেষণটা মন থেকে মুছে ফেলুক—সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা - সে শান্তি পেত। বড্ড একা সে। চারদিকে লোক। কত কাজ কত মন। এ কাজে এ মনে দেবপ্রিয়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সবার মাঝে থেকেও সে নেই। সমস্ত কাজের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেও পারেনি।

যে দিকে তাকায়, শুধু শূন্যতা।

হাতের ঢিল ছুঁড়লে ফিরিয়ে আনা যায় না আর। যার আঘাত লাগল, ক্ষত হল, রক্ত ঝরল, তাকে ভাষার প্রলেপে কি উপশম দেয়া যায়? মুখের কথাও ছিটকে বেরিয়ে, ব্যথার জলে ভরিয়ে তোলে যার দু' চোখ, গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে—কথা ফেরানো যায় না যেমন, ব্যথাকাতর সে মনকে ভোলানোও তেমনি দুষ্কর।

দুষ্কর বলে কি থেমে থাকে কেউ? যা হয় একটা পথ বার করবেই অবিশ্যি যার নিজেকে সংশোধন করার ইচ্ছে।

প্রবাদ আছে সত্যিই কথার মার নেই। এর আবেদন আলাদা। মনের গহনে ঘোমটা ঢাকা এতটুকু যদি সত্যি থেকে থাকে কারো। সেখান থেকে সাড়া মিলবেই। সত্যি সত্যিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য। ঠাকুরদার উপদেশ মনে পড়ল ইন্দ্রনাথের।

একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অভিমানে-ক্ষোভে সারাটা দিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে ইন্দ্রনাথ।

ব্যাপারটা ঘটেছিল একটা ডায়েরিকে উপলক্ষ করে। তখন নয়ে পড়েছে সবে। বাবার বৈঠকখানায় রোজের মতো গেছল সেদিনও। সে সময় বাবা থাকলেও অত কাণ্ড হত না। টেবিলের ওপর লাল মলাটের চকচকে ডায়েরিটা পড়ে রয়েছে। জানত না ওটা বাবার রোজনামচা। পছন্দ হল, তুলে নিয়ে

পকেটে পুরেছে। বাবা ফিরে এসে খুঁজে পায় না। কাপড়ের ব্যবসা। খদ্দেরের কাপড় বাবদ বাকি টাকা নাকি ওতে লেখা আছে।

ইন্দ্রনাথ বলল, সে নিয়েছে। বাবা বলল, তুমি এই বয়েসে চোর হয়েছ ? বড় হয়ে ডাকাত হবে। আর যায় কোথা! ঠাকুর্দার বুকে গিয়ে আছড়ে পড়েছে। ঠাকুর্দা হিতোপদেশ দেবার পর বলেছে, আমার কাছে যা বলেছিস, বল গে যা। চুরি করি পছন্দ হয়েছিল বলে। নিজের ভেবে নিয়েছিলুম। নিজের লোকের জিনিস নিলে কি মানুষ চোর হয় ?

বাবাকে এসে বলেছে। বাবা শান্ত হয়েছে, খুশী হয়েছে। বলেছে, চোর নও তুমি। আমি বুঝেছি।

নিজেকে শোধরানোর সাহস সঞ্চয় করেছে ইন্দ্রনাথ। দেবপ্রিয়া নিশ্চয়ই তাকে ভুল বুঝবে না। এক বলতে এক বলে ফেলেছে অন্য ভেবে।

বলল, কথাটা কিন্তু আসলে আমার মনের নয়। পাথরখনির মৃত্যু আমাকে নিদারুণ আঘাত করে। অতীত ভুলতে পারি না আমি। ছায়ার মতো পিছু পিছু ঘোরে। আমার মতো কেউ এই যন্ত্রণা ভোগ করুক—এটা একেবারেই কাম্য নয় আমার।

ঠিক কথা শুনল। এই শুনতে চেয়েছিল দেবপ্রিয়া। এ মানুষের মুখ দিয়ে এই কথাই তো বেরোন উচিত।

দেবপ্রিয়ার মনের মেঘ কেটেছে। শরতের নির্মেঘ আকাশে ঘননীলের বুকে সাদা পায়রার ঝাঁক উড়ছে, ঘুরছে।

লোটন হাসতে হাসতে হাততালি দিচ্ছে। ওর চোখ আকাশে। ওর চোখ পায়রা ওড়া দেখছে। দেখছে ইন্দ্রনাথ, দেখছে দেবপ্রিয়া।

দেবপ্রিয়া দেখছে এক, শুনছে আর এক।—অতীত ভুলতে পারি না আমি। পিছু পিছু ঘোরে—

এ কথা আজ নতুন নয়। ইন্দ্রনাথের মুখে নয় শুধু, আর কারো মুখে যেন শুনেছে। বহু—বহুবার। কার মুখে ? কিছুতেই মনে করতে পারছে না। কোথায় ?

মাথাটা কি রকম করছে। আনচান করছে বুকের ভেতর। একটা অজানা যন্ত্রণা। কেন—কিসের জন্য—হদিস পাওয়ার যো নেই। এরকম যন্ত্রণা যখুনি হচ্ছে, তখুনি মনে হয়, মরে যাবে বুঝি এবার।

মনে হলেও, মৃত্যুভয় উঁকিঝুঁকি মারে না একটি বারের জন্যও। মরলে, পরম শান্তি পাবে। এই ধারণায় গড়ে বসে। কি ভাবে মৃত্যু আসতে পারে, কি ভাবে মরা যায়—চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীর অবশ হয়ে আসে। অন্ধকার ছাড়া চোখে পড়ে না অন্য কোন বস্তু।

দেবপ্রিয়ার আর একতিল থাকতে ইচ্ছা করছে না পাথরখনিতে। বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে। ডান হাতে বুক চেপে ধরে, সামনের দিকে

একটু ঝুঁকে পড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, লোটন, ওঠ রে, সন্ধ্যে হয়ে এলো যে!

ঝুঁকে পড়ে ওঠার সময় এলোখোঁপার চাঁপাফুল খুলে পড়ে গেছে মাটিতে। দেবপ্রিয়ার অলক্ষ্যে কুড়িয়ে নিল ইন্দ্রনাথ। শুঁকল। পকেটে পুরল। গন্ধটা সতেজ করে তোলে তাকে।

কাছে না থাকলেও, দেবপ্রিয়াকে সর্বসময়ই দেখে যেন ইন্দ্রনাথ। দেবপ্রিয়া ওর দু'চোখের মণিতে ছেপে গেছে।

কোয়ারিতে কাজ দেখার সময়, একা ঘরে শুয়ে থাকে যখন, টাঙায় চড়ে রাস্তায় যায় যখন—দেবপ্রিয়া যেন পাশে। তার বসার সময় বসে, দাঁড়ানোর সময় দাঁড়িয়ে।

নিজের দুঃখ অনুভবের অনুভূতিটা প্রবল বলেই কি দেবপ্রিয়ার বিষাদ-মধুর মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে এত? ওর উদাস চোখের চাউনি তাকেও কোন সুদূরে নিয়ে যায়। ওর অবসন্ন চলনের ছন্দ কত কি না-জানা কথা কয়ে ওঠে। সে কথা না বুঝতে পারলেও, স্বাদের তৃপ্তিতে ভরে যায় ভেতর।

এলাহাবাদ থেকে মা-বাবা আসে প্রতি মাসে একবার করে। ছেলেকে দেখে কাজ কারবার করে। এবারেও এসেছে। ছ'মাস চলছে, এর মধ্যে একদিনও যাওয়ার সময় হল না ছেলের। মায়ের কথায় ইন্দ্রনাথ বলল, সময় পাচ্ছি না। আরো পুরনো হয়ে গেলে, অনেক সময় পাবে। তখন মাসে দু'বার।

বাবা কি চায়, জানে। টাকা ভালোবাসে। এখানে ছেলে বৌ কেউ নয়। নিজের প্রাণকে ভালোবাসে লোকে বেশি। বাবার কাছে তা নয়। নিজের প্রাণ গিয়েও, টাকা যদি আসে—প্রাণ যাওয়াটাই বেছে নেবে বাবা।

বাবাকে বোঝাল—গেলেই লোকসান হয়ে যাবে।

শুনেই লাঠিতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল বাবা।—দরকার নেই, দরকার নেই। আমরা তো আসছিই। বেটা, জান যাক পরোয়া নেই, কারবারে মুনাফা বাড়ে যাতে ইজ্জত বাঁচে যাতে—সেই চেষ্টা করবে। কাঁচাপাকা গোঁফের দু'কোণ পাকাতে পাকাতে বলল, খানদানি রাখে গা তুম! বরবাদ করেগা নহী। ছেলে আমার হুঁশিয়ার, বংশের মর্যাদা বাড়বে বই কমাবে না।

বাবা রওয়ানা হওয়ার সময় ছেলের মাথায় দু'হাত রেখে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করল, লছমীজী জাদা দৌলত দে।

মা দু'হাতের মুঠির বুড়ো আঙুল বার করে মাথার দু'পাশে ঘুরিয়ে, ছেলের মাথার দু'পাশে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, মেরে লাল জিতে রহো।

মা-বাবা চলে গেছে।

উশীনর-অমরাবতী অনুরোধ করেছে অনেক থাকার জন্য। দুদিন পরে দেবপ্রিয়ার জন্মদিন। কাটিয়ে গেলে মন্দ হত না, বলল মা। বাবা রাজী হল

না। চারদিনে চার হাল হয়েছে হয়তো দোকানের। গিয়ে কি দেখবে কে জানে! সামনের বছর এত আগে না এসে, ওই সময়ে আসবে।

দেবপ্রিয়ার চিবুক ধরে বলল, বেটি, দুখ মত কর।

পৌষসংক্রান্তির চারদিন আগে জন্মেছিল দেবপ্রিয়া। সেই দিনটি ফিরে এসেছে আঠারো বছর পূর্ণ করে। সেই দিন সেই ক্ষণ সেই স্নিগ্ধসন্ধ্যা। দেবপ্রিয়া উনিশে পা দেবে।

বসার ঘর সোফা সেটি সাজানো। চার দেয়ালে চার আয়নার ব্রাকেটের ওপর পেতলের ফুলদানিতে গোলাপতোড়া। ফুলদানির পাশে ধূপদানিতে আট-দশটা করে ধূপ জ্বলছে একসঙ্গে।

মেঝেয় চাঁপা রঙের পুরু কার্পেট। হলুদ নিওনলাইট জ্বলছে। চাঁপা রঙের কভারে ঢাকা সোফায় হেলান দিয়ে বসে দেবপ্রিয়া। গয়না পরতে ভালো-বাসে না বলে, আজকের দিনে জোর করেনি অমরাবতী। ওর মন যা চায় তাই করুক।

দেবপ্রিয়া করেছে তাই। বারোমেসে বেড়ানোর সাজেই সেজেছে। তবে শাড়ি-ব্লাউজটা চাঁপা রঙের হলেও নতুন। এলোখোঁপায় দুটো চাঁপা ফুল গোঁজা। গলার সরু হারটা ছাড়া অঙ্গের কোন জায়গায় কোন গয়না নেই।

গণেশের ছবি একটা কাঠের সিংহাসনে বসানো হয়েছে। হলুদ সিল্কের ধুতি পরানো, কোলের কাছে চাদর। গাঁদাফুলে সিংহাসন ঢেকে গেছে।

পুব দেয়াল ঘেঁষে ঠিক নয়, একটু ফাঁক রেখে সিংহাসন বসানো।

কানাতোলা বড় একখানা রুপোর থালায় প্রদীপ সাজানো গোল করে। জ্বলছে। চমৎকার দেখাচ্ছে। লাল বেনারসী শাড়ির আঁচল কোমরে পাক দিয়ে জড়ানো। মাথায় প্রদীপের থালা। দু'হাতে ধরা। ঘরে ঢুকল অমরাবতী।

গণেশের দিকে তিনবার ঘুরিয়ে, প্রদীপের তাপ হাতে নিয়ে, দেবপ্রিয়ার মাথায় কপালে বুকে ছোঁয়াল তিনবার। দরজায় দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ দেখছে। দেবতার মন্দিরে দেবীর আরতি দেখছে যেন। স্বর্গের সুষমা নেমেছে গোটা ঘরটায়। দেবপ্রিয়াকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটি আলোর দেবী বসে আছে। সত্যিসত্যিই ও বুঝি দেবতার প্রিয়া। মানুষের নয়।

পেছন ফিরেই হো-হো করে হেসে উঠল অমরাবতী। আচ্ছা ছেলে তো তুমি! কোথায় এখানে এসে বসবে, তা নয় ওখানে দাঁড়িয়ে! এখানে এস।

এলো। পকেট থেকে ছোট্ট ভেলভেটের বাক্সটার ঢাকনা খুলে, এগিয়ে ধরল অমরাবতীর দিকে।—ওঁর আঙুলে পরিয়ে দিন।

—কেন? তুমিই দাও না।

ইতস্তত করছে ইন্দ্রনাথ।—আমার চেয়ে বরং আ—

—আঃ, থামো। অত বুড়োমি করতে হবে না আর। আমি যা বলছি শোনো। মানুষের শুভেচ্ছাই সব। আসল। উপহারে শুভেচ্ছা জড়িয়ে মিশে থাকে। কোন বাধা নেই। পরাও দিকিন দেখি।

ইন্দ্রনাথের হাতটা জোর করে টেনে নিয়ে, দেবপ্রিয়ার আঙুলে আংটি পরিয়ে দিতে বাধ্য করল অমরাবতী।

অমরাবতী হাসছে খুব।

ইন্দ্রনাথেব ঠোঁটে শিশুর সরল-মিষ্টি হাসি।

দেবপ্রিয়ার দৃষ্টি আটকে পড়েছে আংটিতে। হলুদ পোখরাজটার অসম্ভব জেল্লা। হলুদ হীরে একখানা। প্যাটার্নটা নতুন। দেবপ্রিয়ার কাছে কিন্তু নতুন নয়। কোথায় দেখছে? চেনা আংটি চেনা পাথর চেনা প্যাটার্ন। কার আঙুলে দেখেছে? কে সে? কে, কে?

দেবপ্রিয়ার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। বুকের যন্ত্রণা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। ওইটাই কাল নাকি তার?

আংটির জেল্লা চোখে পড়ছে না আর। কোন কিছুই পড়ে না। চোখ দুটো অন্ধ হয়ে গেছে। তার সমস্ত সত্তা আত্মসাৎ করছে গভীর অন্ধকার। দেবপ্রিয়া ভুলে যাচ্ছে নিজেকে।

ভুলে যেতে যেতে দেবপ্রিয়াকে ফিরে আসতে হয়েছে মাসীমণির ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে।

লোটার জল মাথায় ঢেলেছে, কপালে চোখে জলের ঝাপটা দিয়েছে। গণেশজীর পুজোর গাঁদাফুল নিয়ে মাথায়-চোখে বুলিয়েছে অমরাবতী বার বার। চোখের জল ঝরছে। বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছছে আর ধরা গলায় বলছে, ওমা, রূপা! চোখ চা মা!

দেবপ্রিয়ার মাথার ওপরে দেয়ালে ফটো ঝোলানো মা বাবার। সুবর্ণা আর মিত্রশরণের। ফটোর দিকে তাকাচ্ছে অমরাবতী। উদ্দেশ্য করে বলছে, ভাই দিদি, ভাই জামাইবাবু, তোমাদের মেয়ে—আশীর্বাদ কর। সুস্থ করে তোল।

ইন্দ্রনাথ ভেতরটা দুমড়েমুচড়ে যাচ্ছে। বোবা যন্ত্রণা। এমন অপয়া সে, হরিষে বিষাদ নেমে এলো। আংটিটা পরানোর সঙ্গে সঙ্গে একি বিপত্তি! কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না।

অমরাবতীর কানের কাছে মুখ এনে, ফিসফিস করে বলল, ডাক্তার ডেকে আনব মাসীমণি?

দেবপ্রিয়ার চোখের পাতা নড়ছে। ভেতরের মণিটাও ঘুরছে। হাতের ইশারায় একটু অপেক্ষা করতে বলল অমরাবতী ইন্দ্রনাথকে। বসতে বলল।

ডানপাশের কোচে বসে আছে ইন্দ্রনাথ। উৎকণ্ঠার শেষ নেই। দেবপ্রিয়ার চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ও চোখে না আছে কাজল, না আছে সুর্মা। ঘনপল্লবে ভগবানদত্ত কাজলটানা। মুখে? প্রসাধনের কোন বালাই

নেই। স্নো-পাউডার—কোন কিছুর প্রলেপ না।

আসল রূপের লালিত্য ধুয়ে যাওয়ার নয়, মুছে যাওয়ার নয়। কি মসৃণ কি চকচকে! দৃষ্টি আটকে রেখে দেয়। দেবপ্রিয়ার সঙ্গে না দেখা হলে, এ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারত না ইন্দ্রনাথ। মা-ও যখন পাউডারের পাফ বুলোয় মুখে, তখন ইন্দ্রনাথের চোখে মায়ের আসল মুখটা হারিয়ে যায়। রক্ত-মাংসের মানুষের মুখ যন্ত্রের মানুষের মুখ হয়ে ওঠে।

দেবপ্রিয়া চোখ খুলল। মুখও খুলল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, মাসীমণি, আমি কোথায়?

আর এক লোটা জল আনা হয়েছিল মাথায় ঢালার জন্য। হাতে ধরা ছিল। অমরাবতী অন্যমনস্কভাবে কার্পেটে ঢেলে দিয়ে, দু হাতে জড়িয়ে ধরল দেব-প্রিয়াকে। বলল, কেন—বসার ঘরেই তো রয়েছিস! হাতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, হঠাৎ এ রকম হয়ে গেলি কেন?

—কই—কি হয়ে গেলুম? কিচ্ছু তো হইনি!

অমরাবতীর দু'চোখ বিস্ফারিত। বলল, তোর শরীর ভালো তো?

—কেন—বেশই তো আছি। ঠোঁট-চাপা হাসি চোখ অবধি ছড়িয়ে গেল দেবপ্রিয়ার।

দিনতিনেক আগে জন্মদিন গেছে। আজ চতুর্থ দিনের রাত্তির।

দেবপ্রিয়া দোতলায় যে ঘরে শোয়, একতলায়—ঠিক তার নিচের ঘরে শোয় ইন্দ্রনাথ। মাঝরাতে ঘুম ভাঙতেই দেবপ্রিয়া নেমে এলো ওপর থেকে। পরদা ঠেলে সটান ঢুকল ইন্দ্রনাথের ঘরে। শুধু ঢোকা নয়, যা কাণ্ড করে বসল, সে আর কহতব্য নয়।

পুরনো বুড়ো ঝি—জানকীও চোখে হাত চাপা দিল। কানে তুলো গুঁজল। যে মেয়েকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে জন্মানোর পর থেকে, তার এ কি কেলেঙ্কারি। এ যে ভাবাই যায় না। স্বপ্নও দেখেনি ওকে নিয়ে কেউ এ বাড়ির কখনো।

জ্ঞাতিস্বজন আশপাশের পরিচিত লোক—যে-ই দেবপ্রিয়াকে একবার দেখেছে তার মুখ দিয়েই বেরিয়েছে—মেয়েটার মন অন্য ধাঁচে গড়া। এ মেয়ের পক্ষে এ যুগে খাপ খাইয়ে চলা ভীষণ অসুবিধে। এ যেন মান্ধাতার আমলের। পথ ভুলে এসে পড়েছে। মন সেকেলে, সাজ সেকেলে। সেকেলে মনের স্বামী না পেলেই তো অশান্তি পাবে খুব।

অমরাবতীর কানে কথা উঠতে বলেছে, চেষ্টার কি ত্রুটি করছি কোন? আধুনিক হতে চাইছে কই?

সেই মেয়ে আধুনিককেও হার মানাল।

অমরাবতীর আগের অভ্যেস—দেবপ্রিয়ার ঘুমন্ত অবস্থায় বেরিয়ে যাওয়ার

আতঙ্ক পুষে ঘুমুতো বলে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমকে উঠত। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখত—বিছানায় আছে কি নেই।

এখন মেয়ে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় না বেরোলেও, অভ্যেস ঘুম ভাঙায়। আজও ভাঙিয়েছে। দেখল, মেয়ে নিচে নামছে। অনুসরণ করছে।

জানকীরও অভ্যেস অমরাবতীর মতো। সে-ও উঠেছে। উঠে, ইন্দ্রনাথের ঘরে দেখে, তার নিজের মাথায়ই বাজ পড়ছে। পড়ত না যদি দেবপ্রিয়ার কোন কথা কর্ণগোচর না হত। পেটে পেটে কি শয়তানি বুদ্ধি ধরে, বাব্বাঃ! রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেরিয়ে যাওয়া—স্রেফ একটা ভান। এ মেয়ের মন বুঝবে কে? দেবতার সাধ্যি নেই। কত ছলাকলাই না জানে। ইন্দ্রনাথকে নিয়ে চোখ খুলে গেল সবার।

বংশের মুখে চুনকালি দিতে আর বাকি রইল কি!

আঙুল মটকে মনে মনে দেবপ্রিয়ার মুণ্ডুপাত করেছে জানকী। চোখে জল এসেছে দেবপ্রিয়ার মা-বাবার জন্য। ওরা থাকলে কি এই অনাচার হতে পারত এ বাড়িতে? পুণ্যাত্মা ছিল ওরা। আগে থেকে সরে গিয়ে বেঁচেছে। নইলে আত্মঘাতী হতে হত এই সময়। পায়ে বাতের জন্য চলতে কষ্ট হয়—না হলে জানকী এখুনি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত খাদে।

ভদ্রঘরের ছেলে ইন্দ্রনাথ। কত সম্মানের চোখেই না দেখছে দেবপ্রিয়াকে। এখন কি ভাবল! হতচ্ছাড়ি লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে। ভদ্রতার বালাই নেই কোন।

জানকীর মতো মনের দিক দিয়ে এতখানি নিচে নামেনি অমরাবতী। অমরাবতী পাথর হয়ে গেছল। মেয়েটা কি শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল? এ কি কথাবার্তা! এ কি ব্যবহার! এ কি দেবপ্রিয়া, না অন্য কোন মেয়ে!

আচমকা ব্যাপারে ইন্দ্রনাথ বিস্ময়বিমূঢ়। কি ঘটছে—বুঝতে সময় লেগেছিল একটু। তারপর অমরাবতীর মতো তারও মনের কোণে খটকা লেগেছে—পাগল হয়ে গেছে নাকি! এ যে অসম্ভব কাণ্ড করে চলেছে!

দেবপ্রিয়া কেমন কেমন—একটু অন্য ধরনের। আসলে ও পাগল। পাগল বলেই ওকে ওই রকম মনে হত।

ইন্দ্রনাথ হাত ছাড়াতে চেষ্টা করেছে, পারছে না। দেবপ্রিয়া তত চেপে ধরছে। বলছে, সত্যি বল তুমি, তোমার কোন আঘাত লাগেনি তো? যা হয় হোক—এসপার ওসপার। তোমায় বিয়ে করবই আমি। ইরাবনকে দেখিয়ে দেব—তার কিছু করার ক্ষমতা নেই।

দেবপ্রিয়ার কানে গেল কি না গেল কথাটা সেই জানে। হাত ছেড়ে দিয়ে মুখে-মাথায়, চোখের পাতায়—শেষে হাঁটু থেকে পা অবধি হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে পায়ের ওপর আছড়ে কেঁদে পড়ল।

মহা ফাঁপরে পড়ে গেছে ইন্দ্রনাথ। হাত ধরে তুলতে গিয়ে সঙ্কোচ বোধ

করছে। চিৎকার করে কাউকে ডাকতেও মুখে বাধছে।

কথায় বলে, স্ত্রীলোকের মন দেবতা টের পায় না, মানুষ তো কোন ছার! পুরুষের কাছে স্ত্রীলোক চিরদিনই নাকি অজানা। ছ' মাসের পরিচয়ে কি করে চিনবে দেবপ্রিয়াকে ইন্দ্রনাথ? কোন্ রূপ তার আসল—কে জানে! এটা না আগেরটা, না অন্য আরো কিছু আছে?

ভয় ধরেছে ইন্দ্রনাথের। বড় ঘরের মেয়ে, কব্জায় পেয়ে ফ্যাসাদেট্যাসাদে না ফেলে আবার! কতক মেয়ের তো এই রকম প্রবৃত্তি। এতে আনন্দ পায় নাকি তারা। এটা নৃশংস ধরনের আনন্দ।

জানকীর দাঁত নেই একটাও। মাড়িতে জিভ কাটছে আর গজরাচ্ছে। তাদের আমলে তো ছেলেরাই ধরতে যেত শুনেছে, মেয়েরা ছেলেদের দেখলে পালিয়েছে উর্ধ্বশ্বাসে। দুটো একটা দামড়ি দুষ্টু যে ছিল না, তা নয়। সে তো সবকালেই আছে সব জায়গায়।

এ-রকম গায়ে-পড়া মেয়ে তো দেখেনি জানকী কোনদিন। ছিঃ ছিঃ! ঘেন্নায় অন্নপ্রাশনের ভাত মুখে উঠে আসছে!

ইন্দর দাদাবাবু ভয়ে কাঁটা। আর রূপাদি? মাগো মা—ছাড়বে না কিছুতেই। বিয়ে করবি কর্ না, পছন্দ না হয়, টাকার তো অভাব নেই, টাকা পছন্দ সকলের টাকা দিয়ে কিনে রাখ্। ভাত ছড়ালে কি কাকের অভাব! তা নয়, রাতদুপুরে বেহায়াপনা।

—তোমায় বিয়ে করবো, তোমায় বিয়ে করবো।

জানকীর মনে হয়েছে, কাছে গিয়ে আচ্ছা করে দু'কথা দেয় শুনিয়ে। সিঁড়ির রেলিং ধরে অমরাবতীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘরে ঢুকে গেছে। আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরে দরকার কি তার? বড় ঘরের কেচ্ছায় নাক গলাতে না যাওয়াই ভালো। মাসীমণি তো স্বচক্ষে দেখছে সব, স্বকর্ণে শুনছে সব। নিজেদের মেয়ে, যা বিহিত করে, করুক গে।

ইন্দ্রনাথের সসেমিরা অবস্থা। অমরাবতীর যাওয়া উচিত হবে কিনা ভাবছে। হঠাৎ নিজে নিজেই সচেতন হয়ে উঠল দেবপ্রিয়া। বলল, আমি কোথায়?

ইন্দ্রনাথ অবাক।

ছেলেটার কাছে মুখ দেখানো দায়। তবু লাজলজ্জার মাথা খেয়ে মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য ঘরে ঢুকল অমরাবতী।

কোন কথা কয়নি মেয়ের সঙ্গে, না ইন্দ্রনাথের সঙ্গে। মেয়েকে হাত ধরে বলল, ওপরে চল।

কয়েক মুহূর্ত মাসীমণির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল দেবপ্রিয়া। তারপর বলল, কে—মাসীমণি?

—হ্যাঁ, চল।

দেবপ্রিয়াকে নিয়ে অমরাবতী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ইন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখল কিনা বুঝতে পারছে না।

কোন মেয়ে কি এমন কান্ড করে, এমন কথা বলে কাউকে? যত চিন্তা করছে, তত মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে উঠেছে ইন্দ্রনাথের। দেবপ্রিয়াকে পাগল না ভেবে পারা যাচ্ছে না। অথচ পাগল ভাবলে, নিজেরই কান্না আসছে।

হয়তো এ ঘরে কেউ গেস্ট হিসেবে থাকত আগে। দেবপ্রিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছিল। কে বলতে পারে—পাথরখনির দুর্ঘটনায় হারিয়ে যায়নি সে! হয়তো কেন—এইটাই সত্যি হলেও হতে পারে।

সে শোকে দেবপ্রিয়া সদা-সর্বদা উদাসীন। কথাবার্তাও স্বাভাবিক সুস্থ মনের মানুষের মতো নয়। ও কি ভাবে—বুঝতে পারে না, কি করে—জানে না ইন্দ্রনাথের দুঃখ হয় দেবপ্রিয়ার জন্য।

রাতে চোখের পাতায় ঘুম নামেনি আর। দোষ দিতে গিয়েও ইন্দ্রনাথ বিবেকের চাবুক খেয়েছে। নিজের মন নিয়ে অন্যের বিচার করলে, অবিচারই করা হবে। তার মন নিয়ে তাকে বিচার করবে। ভুল ভাবা আর ভুল করা থেকে বেঁচে যাবে তাহলে।

সূর্য উদয় পর্যন্ত গোটা ঘরটায় পায়চারি করেছে। দেবপ্রিয়াকে নিয়ে কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছুতে পারেনি।

সকালে অমরাবতী এসে ক্ষমা চেয়েছে মেয়ের ব্যবহারের জন্য। তারা লজ্জিত। তারা আকাশ থেকে পড়েছে—এমন করল কেন ও। মনের ডাক্তার দেখানো হবে। জানে না অদৃষ্টে কি রায় লেখা আছে ওর। কান্না চাপতে পারেনি অমরাবতী। দু' চোখে হাত চাপা দিয়েছে।

ইন্দ্রনাথ বলেছে, মা আর মাসী এক জাতের। ক্ষমা চাইলে আমারই অমঙ্গল হবে যে। অমরাবতীর চোখের জলের ছোঁয়া লেগেছে তার চোখে। মাথা নিচু করে বলল, ভাববেন না। ও ভালো হয়ে উঠবে ঠিক।

একটা রহস্য ঘনিয়ে এলো দেবপ্রিয়াকে নিয়ে।

ভালো করে তোলার দায়িত্ব পড়ল ইন্দ্রনাথের ওপর।

মনের ডাক্তার বলেছে, কথা বার করে মনের চেহারা বার করা শক্ত, অন্তত দেবপ্রিয়ার পক্ষে। ক'টা সিটিংয়ের মধ্যে একটাতেও ওর মুখ খোলাতে পারেনি। 'কিচ্ছু জানি না' ছাড়া ও আর কোন কথা বলতেই জানে না। যার কাছে গেছল, সে-ই একমাত্র মন বুঝে দেবপ্রিয়ার মনের গহনে যে মন লুকিয়ে বসে আছে, তার চরিত্র তার চাওয়া জেনে নিতে পারে অনায়াসে।

অমরাবতী অনুনয়বিনয় করে বলেছে ইন্দ্রনাথকে, বাবা, তুমিই একমাত্র এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারো। না হলে মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। সুস্থ মনের মানুষ হয়ে উঠবে না আর কোনদিন। এখুনিই তো ও থেকেও নেই।

ডাক্তারের চেম্বারে গেছে ইন্দ্রনাথ হন্তদন্ত হয়ে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়েছে খানিক ডাক্তার। আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়েছে একবার। মুখেচোখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠছিল। হাসি চাপতে গিয়ে ঠোঁটে রুমাল চেপে ধরেছে। গলা খাঁকারি দিল বার দুয়েক।

বল্ল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনিই পারবেন। শুনলুম, আপনারা বিকেল বেড়াতে বেরোন পাথরখনিতে। ওই সময় প্রকৃতির মেজাজটা ঠাণ্ডা থাকে। ও যা বলে, চুপচাপ শুনে যাবেন স্থির হয়ে। কোন কথা অসংলগ্ন মনে হলে, বাদ-প্রতিবাদ করবেন না মোটে।

ডাক্তার হেসে ফেলল। ছদ্মগাম্ভীর্য রাখা সম্ভব হল না আর। হাসতে হাসতেই বলল, ডোণ্ট মাইণ্ড। মেয়েটা দেখছি ভীষণ চাপা। পাথর কাটতে কাটতে তলা মেলে তবু, জলের হদিশ পাওয়া যায়! কিন্তু এ মেয়ের মনের তলার হদিশ পাওয়া মুশকিল। আমার যতটুকু মনে হয়—এক্সকিউজ মী—আপনিই হোন কিংবা আপনার মতো অন্য কারো ছবি ওর ভেতরে খোদাই হয়ে রয়েছে। নিজের অগোচরে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে আপনাকেই উপলক্ষ করে।

ইন্দ্রনাথের কানে বিস্ময় ঝরেছে, মনে বিস্ময় ভরেছে। নিজে জড়িয়ে পড়ছে মনস্তত্ত্বের অকাট্য যুক্তির বাঁধনে। বাঁধনে বাঁধা পড়লেও এখান থেকে চলে যেতে পারে সহজে। কার কি হবে—মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই।

স্থির করল, এলাহাবাদে চলে যাবে। দেবপ্রিয়ার মনে তার ছাপ পড়লে, মুছে যাবে দু'দিন পরে। অন্যের ছাপ পড়ে থাকলে বুঝবে মাসীমণি-মেসোমণি, সে নয়!

যাওয়ার আগের দিন লোটন এসে বল্ল, রুপাদি ডাকছে আপনাকে ইন্দরদা।

যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিল যত, ততই ইন্দ্রনাথের মন খারাপ হয়ে আসছিল। যাওয়ার ইচ্ছেটা নিস্তেজ হয়ে আসছিল। মাসীমণি-মেসোমণি কেউ একবার থাকতে বলুক না।

সত্যি কথা বলতে কি, 'যাবো যাবো' মুখেই বলছে, অন্তরের কথা নয়। দেবপ্রিয়াকে ছেড়ে মন যেতে চাইছে না মোটে। দেবপ্রিয়া সুস্থ হয়ে উঠলেও বা কথা ছিল। ডাক্তারের অনুরোধ, মাসীমণির অনুরোধ। এদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে পালানো কাপুরুষের লক্ষণ। দেবপ্রিয়াকে বিপদের মাঝে ফেলে রেখে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া।

লোটনের ডাকে আকাশের চাঁদ হাতে পেল্ল ইন্দ্রনাথ।

দেবপ্রিয়ার ঘরে এল।

ডেকে পাঠিয়েছে বটে, কিন্তু আংটির দিকে চোখ রেখে এমন ধ্যানমগ্ন যে, দেবপ্রিয়াকে লোটন ডাকতে সাহস করল না। ইন্দ্রনাথও কিছু বলল না। পাপোশের ওপর পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখছে। লোটন পাশে দাঁড়িয়ে। ও ছটফটে। এক্ষেত্রে কিন্তু ধীরস্থির।

কতক্ষণ আর ধীরস্থির থাকা যায়? একটু পরেই উসখ্স করতে লাগল লোটন। র্পাদি বেশ মজার মান্ষ তো। ইন্দরদাকে ডাকতে বলে খেয়ালই নেই।

কাছে এগিয়ে গেল।

দেবপ্রিয়ার দ্ষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ইচ্ছে করেই ধপাস করে বসল কৌচে।

চমকে উঠল দেবপ্রিয়া।

হি-হি করে হেসে উঠল লোটন। ইন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বলল, র্পাদি কি ভীতু!

নিজেকে সামলাতে দেবপ্রিয়ার সময় লাগল একটু। আংটিটা আঙ্ল থেকে খ্লে, হাতে করে ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে দেখছিল। দেখে দেখেও দেখার শেষ হচ্ছিল না। মনে হয়েছে কত গোপন কথা ল্কনো রয়েছে আংটির এই পাথরে, এই প্যাটার্নে। যে দিয়েছে, তার না বলা ব্যথা আংটির জেল্লায় ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। এক এক করে বেরিয়ে আসছিল, আর সেই সময় এই বাধা।

ধপাস করে কৌচে বসা নয় তো, দেবপ্রিয়ার ব্কের হাড়পাঁজরা গ্ঁড়ো করে হৃৎপিণ্ডের ওপর চেপে বসেছে লোটন।

চমকে ওঠার সময় আংটিটা হাত থেকে ছিটকে পড়েছে কার্পেটের ওপর। পড়ে আছে।

এগিয়ে এলো ইন্দ্রনাথ। তুলে নিয়ে দেবপ্রিয়ার হাতে দিল। আংটির দিকে একবার আর ওর দিকে একবার তাকাল দেবপ্রিয়া। জোরে নিশ্বাস ফেলল একটা। ওর হাতের তেলো থেকে আস্তে আস্তে তুলে নিল আংটিটা। ডান হাতের মাঝের আঙ্লে গলিয়ে বলল, বসুন। শরীরটা ভালো নয়। নইলে আপনার ঘরে যাচ্ছিল্ম। ডেকে এনে কষ্ট দিল্ম। এদিকের গদি-আঁটা চেয়ারে বসল ও। বলল, তো মোটে একতলা থেকে দোতলা। পাথরখনিতে কত তলা নামি-উঠি বল্ন তো!

তাকে অবাক করে দিয়ে দেবপ্রিয়া বলল, আংটির ডিজাইনটা কার মাথা থেকে এসেছে বল্ন তো?

—আমার মাথা থেকে।

—আপনার?

—হ্যাঁ।

দেবপ্রিয়ার ভেতরটা হাঁকুপাকু করছে। কি একটা জানতে চেষ্টা করছে, ভুলে যাচ্ছে। মনে আসছে ভেসে ভেসে। অস্পষ্ট ক্ষীণ। আবার সরে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। বস্তুটা কি ব্ঝতে পারছে না। না ব্ঝতে পারার কি যে কষ্ট—কাকে জানাবে?

ভেতর থেকে কে যেন বলছে, কাউকে—জানানোর চেয়ে, আংটিটাকে জানালেই কাজ হবে। এ আংটি জীবন্ত।

এ ভাব মনে এল কেন? এটা ভাবা নয়, এটা মিথ্যে নয়। এটাই আসল সত্যি। আংটিটা জীবন্ত, জীবন্ত, জীবন্ত।

রেশমিনার বাবা দূরে দাঁড়িয়ে। মেয়েটা কেমন লাঠিখেলা শিখেছে। একটা-মাত্র মেয়ে। বাবা বলে, ও আমার একশো ছেলের কাজ করবে দেখো সাহেবা। ছেলে ছেলে করে মনমরা হয়ো না অত!

মা-বলেছে, মেয়েকে মেয়ে তৈরী করবে, তা না ছেলে! এমন বাপও দেখিনি। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো। পুরুষের শক্তিতে পারবে কেন?

বাবা জোর দিয়ে বলছে, তুমি বড্ড দুর্বল। ওসব বাজে চিন্তা করো না। একটু ধৈর্য ধরে দ্যাখো, তারপর দোষ দিও।

রেশমিনার মাও আজ বাবার পাশে দাঁড়িয়ে। বাবার মতো হাসিমুখ নয়, ভীতসন্ত্রস্ত। মনে মনে গাল দিচ্ছে স্বামীকে। মতিচ্ছন্ন আর কাকে বলে! মেয়েটাকে ধিঙ্গী করল নিজের গোঁয়ার্তুমির জন্য। ছেলেদের সঙ্গে লাঠি খেলে বাহাদুরি নেবে নাকি। মাথা ফেটে, হাত-পা ভেঙে না পড়ে থাকে শেষে। অঙ্গহানি হলে যে বিয়ে হবে না, এ বুদ্ধিটাও ঘটে নেই।

মা আসতে চায়নি দেখতে, বাবাই জোরজবরদস্তি করে নিয়ে এসেছে। বাবার হাসি দেখে, কান্না আসছে মায়ের। মেয়েটাকে বকুক মারুক—গেলে তো তারা যাবে। ওর আর কি!

হাসির ছিরি যা! তবু যদি তার দাঁতের মতো সাদা দাঁত হত। দোক্তার ছোপে ছোপে একটা দাঁত তো দোক্তাপাতা। বাবার দিক থেকে চোখ ফেরাল মা।

অধিরথ চাঁপাগাছের তলায় বসে আছে। ও লাঠি খেলা তলোয়ার খেলার মধ্যে নেই। রুগ্ন মানুষ। আসে বেড়াতে। চুপচাপ বসে থাকে গাছতলায়। টপ টপ করে চাঁপাফুল খসে পড়ে ওর মাথায়। মাটিতে পড়লে কুড়িয়ে নেয়। জড়ো করে রাখে। বাড়িতে নিয়ে যায় ফেরার সময়।

তবুও মুখে আতঙ্কের ছায়া।

রেশমিনার ভয়ডর নেই কোন, নির্ভয়।

পুরুষের সাজ। পরনে পাজামা-মির্জাই। কোমরে একটা পাতলা লাল ওড়না পাকিয়ে পাকিয়ে শক্ত করে বাঁধা। সাদা পাগড়িতে ঢেকে রয়েছে সমস্ত চুল। আঠারোয় তেরো বছরের কিশোর দেখাচ্ছে ওকে।

ইরাবন ছেলেদের দলের সর্দার। লাঠিখেলায় ও থাকবে না। ওর দলের সঙ্গে খেলবে রেশমিনা। ইরাবন অধিরথের মতো নয়, সুস্থ-সবল। দুর্দান্ত দুঃসাহসী। ও লড়বে না কেন—তার অন্য কারণ আছে। বাবার মতো ও-ও চায় রেশমিনা জিতুক। ওর ধারণা ও থাকলে রেশমিনা হেরে যেতে পারে। তার ওপর লাঠি তুলতে গেলে পারবে না। হাত নেমে আসবে আপনা হতেই।

অধিরথের পাশে এসে বসে আছে ইরাবন। দর্শকের ভূমিকা তার। হাসছে রেশমিনার দিকে চেয়ে। হাত নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছে।

ছেলেদের সঙ্গে রেশমিনার যে এব প্রথম লড়াই বা পরীক্ষা তা নয়, অবিশ্যি একটা গোটা দলের বিপক্ষে লড়েনি এর আগে। দু-একজন ছেলের সঙ্গে লড়েছে সে। জিতেছে, বাহবা পেয়েছে।

সব কটা ছেলেই আঠারো-উনিশ-বিশের মধ্যে। রাজপুত রক্ত, বলিষ্ঠ-সুঠাম দেহ। সহেটমহেট গাঁয়ে এদের নামডাক খুব। লাঠি তলোয়ার মারদাঙ্গায়—সবেতে ওস্তাদ। বুড়োরা বলে, এরাই আমাদের যৌবন, মান-সম্ভ্রম।

চাঁপাগাছের দিকে একা রেশমিনা। বিপরীতে দশ-দশটি তরতাজা ছেলে লাঠি কাঁধে দাঁড়িয়ে। ওরা যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রস্তুত। রেশমিনাকে কিশোর দেখাচ্ছিল, এখন একেবারে যুবক। শুধু যুবক নয়, চেহারাটা যেন চতুর্গুণ বড় হয়ে গেছে। মুখে দৃঢ়তার ছাপ, ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। ভাবটা, এরা তো তুচ্ছ। এদের পাঁচগুণ জড়ো হলেও তার একার সঙ্গে পেরে উঠবে না। হিম্মত কাকে বলে, দেখিয়ে দেবে রেশমিনা। ভুল প্রমাণ করে দেব, অভ্যেস করলে, শক্তিতেও ছেলেদের চেয়ে এতটুকু কম যায় না মেয়েরা।

শুরু হল লাঠি খেলা।

প্রথমে এক একজনের সঙ্গে লড়ল রেশমিনা। কি মূর্তি, কি শক্তি! মায়ের বুকে কাঁপুনি ধরেছে। সর্বনাশীর এ যে রাক্ষুসী মূর্তি। এমন তো দেখেনি কখনো!

প্রত্যেকেই পরাজয় স্বীকার করেছে রেশমিনার কাছে। নতজানু হয়ে মিহি ফিকে সবুজ ঘাসের ওপর বসে, লাঠি রেখেছে পাশে। কপালে হাত ঠেকিয়ে রেশমিনাও কপালে আঙুল ছুঁইয়েছে আলতোভাবে।

রাগে ফুলছে মা। এও দেখতে হল, এও সহ্য করতে হচ্ছে। দেখাচ্ছে বাড়িতে ফিরে। কর্তার একদিন কি তার একদিন। মেয়ের আর কর্তার পায়ের গোছ ভেঙে দেবে। দেখবে বাইরে বেরোয় কেমন করে!

কে কার পায়ের গোছ ভাঙবে? দেখে তো মায়ের চক্ষুস্থির। এবার দশ-জনের সঙ্গে একা লড়ছে মেয়ে। রণরঙ্গিণী চণ্ডী। কখনো ছেলেরা গোল হয়ে ঘিরে ধরছে ওকে, কখনো দূরে পালাচ্ছে এক এক করে।

এবারেও বিজয়লক্ষ্মী রেশমিনার পক্ষে। একজোট হয়ে দশজনে লড়েও হেরেছে। সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে দশজনে, বুকে হাত রেখে মাথা নুইয়েছে।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে মায়ের। হোক পেটের মেয়ে—মা এতে খুশী নয় একদম। জেনানা হল মরদ, আর মরদ হল জেনানা। এ মেয়ে শুনবে কার কথা? শাসন করবে কে? কিছু বললে, মেয়ে তো লাঠি পেটা করে হাড়গোড় ভেঙে খতম করে দেবে!

নিন্দুকেরা চোখের সামনে সত্যি দেখেও, নিজের আদরণে না চেকে কেমনে

তৃপ্তি পায় না। কতক বুড়োবুড়ী হাসাহাসি করতে লাগল। তাদের মন্তব্য—এ যেন সাজানোগোছানো। ছেলেরা পণই করেছিল, রেশমিনার কাছে হারবে। আর ওই যে পালের গোদা, আনন্দে ডগমগ—ইরাবনটা কম! ওরই যত কারচুপি। ছেলেদের শিখিয়ে রেখেছে হারতে। ওরও যে মুখটা পোড়া গেল—সে হুঁশ নেই।

ইরাবনের কানে কথা গেল। রেগে অগ্নিশর্মা। মুখখানা এমন লাল হয়ে উঠছে যে, ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটে বুঝি।

লাঠি নিয়ে মাঠে নামল। এত বড় মিথ্যে সওয়া যায় না। আসুক বড়রা। ইরাবন আর রেশমিনা লড়বে। হার মেনে পরীক্ষা করে নিক তারা।

বুড়োবুড়ীদের আবার মন্তব্য—বাবা, বিয়ের কথা চলছে দুজনের, এখনো বিয়ে হয়নি তবু। রেশমিনাকে কে কি বলছে—কথার ভর সয় না। আ মর ছোঁড়া! বিয়ে হলে, ওই দজ্জালনীই দেখিয়ে দেবে মজা। উঠতে-বসতে লাঠি। তখন এই হম্বিতম্বি থাকবে কোথা! হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধন।

কথায় তরফাতরফি হয়েছে স্রেফ। আত্মসম্মানহানির ভয়ে বড়রা নামেনি মাঠে। স্বস্থানে প্রস্থান করছে যে যার।

অধিরথের খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। জ্বরবিকার। উত্থানশক্তিরহিত। ইরাবন ভেঙে পড়ল। ওই একমাত্র প্রাণের বন্ধু তার। ভায়ের চেয়েও ভালোবাসে। চাঁপা ফুল নিয়ে কি রক্তারক্তিই না হয়ে গেল একদিন। তাও আবার অন্য কারো সঙ্গে নয়, এক রক্তের—নিজের ছোট ভায়ের সঙ্গে।

গাছের ফুল যা মাটিতে পড়বে, সমস্ত প্রাপ্য অধিরথের, ফতোয়া জারী করেছে ইরাবন নিজেই। অধিরথ তাদের সকলের মতো খেলাধুলো করতে পারে না। ফুল নিয়েই ও বেচারার যত আনন্দ। ওর ফুলে যদি কেউ হাত দেয়, তার আর রক্ষে নেই।

কি যে দুর্বুদ্ধি পেয়ে বসল ছোট ভায়ের কে জানে! দাদাকে ভালো রকমই চেনে। জান যাবে তো কথা নড়বে না।

মাটিতে পড়া চাঁপাফুলগুলো পায়ে দলে পিষে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, জিভ ভেঙচে হাসতে হাসতে চলে গেল।

ম্লানমুখে বসে আছে অধিরথ। চোখ ছল ছল করছে। ইরাবন এসে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোর? উত্তর পেল না। অন্যের মুখে ভায়ের কাণ্ড শুনে মাথায় রক্ত চড়ল।

ঘুষিতে ঘুষিতে নাক-মুখ থেঁতো করল ভায়ের। রেশমিনা সামনে এসে না আটকালে কি যে হত ভগবানই জানেন।

বন্ধুর জন্য কত ভাবে ইরাবন। অধিরথের ছোটবেলায়—সেই যে মা মারা যেতে অজ্ঞান হয়ে গেছল, তারপর থেকে একটু একটু করে শরীর ভাঙছে তো

ভাঙছেই। একটা রোগ সারতে না সারতে আর একটা রোগ এসে হাজির। ওকে দুনিয়া থেকে সরানোর এ যেন চরম ষড়যন্ত্র।

অসুখ শুনে রেশমিনাকে বলেছে ইরাবন, তুমি ছাড়া ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না কেউ। সেবার হাতযশ আছে তোমার। কতবার তো মরণাপন্ন অসুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছ, এবারে পারবে না ?

ইরাবনের জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে রেশমিনা অভয় দিয়েছে, তুমি আমার পাশে থাকলে, নিশ্চয় ও ভালো হয়ে উঠবে। এত ঘাবড়াচ্ছো কেন ?

যে মানুষ বাইরে ইস্পাত, ভেতরে সে নরম তুলতুলে। এই জন্যই ইরাবনকে ভালো লাগে রেশমিনার। মানুষটার মন আছে, সব চেয়ে বড় কথা, হৃদয় আছে।

যার সোনার হৃদয় দেখেছে রেশমিনা, তাকে যে কখনো হৃদয়হীন দেখবে, এ কল্পনা কি কারো মনের কোণে উঁকি মারতে পারে ? রেশমিনারও উঁকি মারেনি। উঁকি মারলে তো তবু ভালো ছিল, প্রত্যক্ষ দুর্যোগ এসে হাজির হল সামনে।

দুর্যোগে রেশমিনার মন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেল। আগের ধারণার কোন অস্তিত্বই রইল না। ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এমন হোক, চায়নি রেশমিনা। বেশি কষ্ট হয়েছে ইরাবনের মধ্যে থেকে তার জীবনদেবতাকে হারিয়ে ফেলল বলে।

অধিরথ সুস্থ হয়ে উঠছে। রেশমিনা রোজ আসে। বেশ কিছুক্ষণ থাকে। সেবাশুশ্রূষা করে বাড়ি ফেরে। ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে যায় ইরাবন।

সেদিন মুখখানা ভার ভার। পথে যেতে যেতে ইরাবন কর্কশগলায় বলল, আমি চাই না তুমি আর এখানে এসো। পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়। শুনতে পাও না তুমি ? দুদিন বাদে বিয়ে। খানদানের মর্যাদা রাখতে হবে। বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো চলবে না।

রেশমিনা কি মরেছে, না বেঁচে আছে ? কার মুখে কি কথা শুনছে ? ঠিক শুনছে তো ? হ্যাঁ, ঠিকই শুনছে। ইরাবন বলছে, ঢের সহ্য করেছি, করছি। আর নয়। বন্ধু—বিশ্বাসঘাতক। খালি রেশমিনা রেশমিনা রেশমিনা। রেশমিনা কি ভালো মেয়ে। কি সেবা না করে। বাঁচিয়ে তুলল আমায়। এ আর শুনতে পারা যায় না। শয়তান !

দাঁত কড়মড় করে বলল ইরাবন, মনে হয় মাথাটা চিবিয়ে খাই।

হাসছে রেশমিনা।—পাগল হতে আর বেশি দেরী নেই তোমার। অধিরথ একটা অসহায় শিশুর মতো। ওকে ওর অতিবড় শত্রুও খারাপ ভাবতে দ্বিধা করবে। তুমি কি ? তোমার মাথায় অপদেবতা ভর করছে নিশ্চয়।

—ওসব বাজে কথা বলে ভোলানো চলবে না আর। অধিরথ শিশুর মতো ! খলিফা কোথাকার !

রেগে উঠল রেশমিনা। বলল, এতদিন এসেছি। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরো দু'চার দিন বাকি। এক কলসী দুধে একফোঁটা গোচনা ফেলব না আমি। আমি আসবোই। কারো কথা শুনবো না। যে যা ভাবে ভাবুক, যে যা বলে বলুক।

মেঘের গর্জনে ফেটে পড়ল ইরাবন।

—তোমার দরদ তো ওর ওপর হবেই। কি করে শায়েস্তা করতে হয় দেখিয়ে দেব। এ বান্দা সহজে ছাড়ার পাত্র নয় কাউকে।

ইরাবনের যেমন জিদ আছে, রেশমিনারও তেমনি আছে! বরং আরো বেশি। রেশমিনা আগে যাও বা দিনে দুবার আসত, এখন চারবার আসে। বসে বসে গল্প করে। অধিরথ যেতে বললে, 'একটু পরে যাচ্ছি' বলে কাটিয়ে দেয়।

ইরাবনের চররা অধিরথের বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়ায়, রেশমিনার বাড়ির সীমানায়ও। অধিরথের বাড়িতে ইরাবন নিজেই এসে শাসিয়ে গেল, বড্ড বাড় বেড়ে উঠছিস দেখছি। অসুখে বেঁচে উঠেছিস, কিন্তু এবারে সাক্ষাৎ কালের কোপে পড়েছিস জানবি। রেশমিনার আসা বন্ধ কর্ বলছি, নইলে—

শেষটা আর শেষ করেনি ইরাবন। তড়িৎগতিতে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

রেশমিনা আসতে অধিরথ বলছে সমস্ত। বলেছে, রেশমি, যা গোঁয়ার-গোবিন্দ ও, দরকার নেই এসে। আমি ভালো হয়েছি, আস্তে আস্তে গিয়ে দেখা করে আসবো'খন।

—আমার ওখানে যাওয়াটা কি পছন্দ করবে?

—কেন করবে না? তোমার আসা নিয়েই তো আপত্তি ওর।

—না, তোমার যেয়ে দরকার নেই। মন-প্রকৃতি পাল্টেছে ওর। ওর ভেতরে সেই মানুষটা মরে গেছে। তা না হলে মুখে আনে কি করে ওই সব কথা! যতই তড়পাক না কেন—আমার সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল হবে রাস্তাঘাটে। তোমার সঙ্গে তো সে প্রশ্নের বালাই নেই।

পরের দিন রেশমিনা আসার অনেক আগেই অধিরথ পৌঁছুল ওদের বাড়িতে। দেখেই রেশমিনার বুক কেঁপে উঠেছে। একটা উত্তাপ অনুভব করেছে বাতাসে। প্রাণ শুষে নেবার উত্তাপ। ইরাবনের নিশ্বাসের উত্তাপ।

অধিরথকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বাড়ি পেঁছে দেবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে রেশমিনা। বসতে বলতে ভুলেছে, মেঠাই জল দিতেও ভুলেছে।

হেসে বলল অধিরথ, এত চঞ্চল হয়ে উঠছো কেন? ও এসে দেখে ফেললেও কোন ভয় নেই। ইরাবন আমায় প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে।

রেশমিনা দেখছে অধিরথের পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। ভালো হয়ে উঠলেও, বেশি চললে হাঁপিয়ে পড়ে, একটু দাঁড়িয়ে থাকলে পা অবশ হয়ে আসে।

দড়ির চারপাইয়ের ওপর অধিরথ বসে পড়ল।

বলল, লোকের কথা শুনে ইরাবন নাচছে। কাকে কান নিয়ে গেল, কানে

হাত দিয়ে না দেখে ছুটোছুটি করলে চলবে না তো। আমি চাইছি, ও আজ এসে পড়ুক।

যে মেয়ের শক্তির তুলনা হয় না, লাঠি খেলে তলোয়ার খেলে, ছেলেদের কাবু করে দেয়—সেই মেয়ের একটা অজানা আতঙ্কে সারা শরীর ঝিমঝিম করছে।

দূরে সরে বসতে গিয়ে অধিরথের পাশেই বসে পড়ল রেশমিনা। রেশমিনা কেবলি দেখছে একটা কালো ছায়া। অধিরথের পাণ্ডুর বর্ণ কপালে লেপে গেছে যেন।

পোড়া চোখে আগুন লাগুক। রেশমিনা দৃষ্টি ফেরাল অন্য দিকে। কয়েক মুহূর্ত। আবার তাকাল অধিরথের দিকে। সেই একই দৃশ্য। ভয় পেলে ভয় সামনে এসে হাজির হয়। হলও তাই।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় চরেরা খবর দিয়েছে ইরাবনকে। অধিরথকে অনুসরণ করেছে। ইরাবন ঘরে ঢুকল। বাঘের চোখের মতো দু' চোখের তারা জ্বলছে। আগুনের ভাঁটা। চোখের আগুন হাতে নামল। ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল অধিরথের গালে। বিকৃত গলায় বলল, একেবারে পাশাপাশি!

চোখে অন্ধকার দেখে পড়ে যাচ্ছিল অধিরথ, ধরে ফেলল রেশমিনা। তীব্র তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলল, তুমি পশু একটা। ওর দেহে কি আছে? এখুনি মরে যাবে যে এভাবে মারলে! বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

রাগে গন্‌গন্‌ করতে করতে বেরিয়ে গেল ইরাবন।

খানিক পরে রণংদেহী মূর্তিতে অধিরথকে নিয়ে বেরিয়েছে রেশমিনা। চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি। কেউ একবার ওর ধারে কাছে আসুক, কেউ একবার অধিরথের গায়ে হাত ঠেকাক। রেশমিনা উচিতমতো শিক্ষা দেবে। মৃত্যুকে ভয় পায় না সে। সে মরলেও অধিরথ বাঁচবে।

রাস্তা থমথমে। আশপাশে যে ঘাপটি মেরে লোক লুকিয়ে রয়েছে, সুযোগ পেলে নরখাদকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে অধিরথের ওপর, সে আঁচ পাচ্ছে রেশমিনা।

শক্ত মুঠোয় অধিরথের হাত ধরল। হনহন করে চলছে!

অধিরথ যেন কেমন হয়ে গেছে। রেশমিনার হাতের পুতুল।

মানুষের সাহস আর মনের জোরের কাছে অস্ত্র-লোকবল—সব তুচ্ছ। অধিরথকে পৌঁছুনো অবধি পথে কোন বিপত্তি ঘটেনি। রেশমিনাও নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরেছে। আসার সময় অধিরথকে বুঝিয়ে এসেছে, ইরাবন নৃশংস বর্বর হয়ে উঠেছে। দেখলে তো প্রমাণ, আমার ওখানে যেও না আর। আমি রোজ আসবোই। রুখতে পারবে না কেউ।

রাতভোর নিদারুণ অস্বস্তি ভোগ করেছে অধিরথ। ইরাবনের বিচ্ছিরি মনোভাব এসে পড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে। ওর ভেতর ঠাণ্ডা না হলে, অধিরথের ভেতরও ঠাণ্ডা হবে না। সমস্ত খুলে বলবে সে। একটা কথাও গোপন করবে না।

সকাল না হতেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ইরাবনের বাড়ি যাবে। কমজোরি পায়ে টলতে টলতে হাঁটছে। হাঁটছে আর ভাবছে।

অধিরথের মায়ের পুরো স্বভাবটা রেশমিনা পেয়েছে। অধিরথ অসুখে পড়ল, মা যেমন অস্থির হয়ে পড়ত, রেশমিনাও ঠিক তেমনি হয়ে পড়ে। যন্ত্রণায় কাতরে কাতরে অধিরথ ঘুমিয়ে পড়েছে, আচমকা ঘুম ভেঙে চোখ চেয়ে দেখেছে, ভগবতীর ছবির দিকে চোখ বুজে প্রার্থনা করছে মা। চোখের জল গাল বেয়ে পড়ছে টসটস করে। রেশমিনাকেও ওই মূর্তিতে দেখেছে অধিরথ।

এ কথা জানলে, ইরাবনের মন পালটাবে। সবকিছু দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ-সুন্দর হয়ে উঠবে। শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবে ইরাবনের ভেতর। অধিরথের চোখে রেশমিনা দেবী। রেশমিনাকে শ্রদ্ধা করে অধিরথ, ভক্তি করে।

মর্মান্তিকের চেয়েও মর্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল। ভাবনায় ছেদ পড়ল অধিরথের। অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, মা-গো।

লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়। লাঠির ঘা পড়েছে দু'পায়ে। ইরাবনের কড়া হুকুম, পা দুটো এমন করে দিবি, যাতে রেশমিনার বাড়ি যেতে না পারে। ইরাবনের চরেরা হুকুম তামিল করেছে সর্দারের।

মোক্ষম আঘাতে অধিরথের দু'পায়েরই হাড় ভেঙেছে।

খবর পেয়ে উন্মাদের মতো ছুটে এসেছে রেশমিনা।

রেশমিনার বাড়ির দরজার গোড়া দিয়ে পঞ্চাশবার যাতায়াত করে ইরাবন। আসল উদ্দেশ্য, রেশমিনার সঙ্গে একবারটির জন্য দেখা করা।

দেখা আর হয় না। রেশমিনা জানলার পাল্লায় ছিটকিনি এঁটে, ভেতর থেকে বন্ধ রাখে। যে বিবেক-বুদ্ধি হারিয়েছে, অকারণ একটা নির্দোষ মানুষের সঙ্গে এমন নির্মম ব্যবহার করতে পাবে, সে মানুষ মানুষ নয়। মোহগ্রস্ত হয়ে এতদিন ধরে কাকে তার মনের আসনে আদর্শ-পতির মূর্তিতে বসিয়ে রেখেছিল।

আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করে রেশমিনার। তাকে উপলক্ষ করে একটা ফুলের মতো পবিত্র মানুষ অকালে ঝরে না যায়। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছে। অমঙ্গল চিন্তা মাথায় আসছে কেন?

অধিরথের জন্যই তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে অধিরথকে। প্রথমে ভাবা গেছল, পায়ের হাড় ভেঙেছে শুধুই। দেখা গেল, দুটো পা-কেই থেঁতো করে দিয়েছে একেবারে। বাদ দেয়া ছাড়া উপায় রইল না আর।

অধিরথের পা যেতে রেশমিনা কেঁদে আকুল হয়েছে। অধিরথের পা না গিয়ে, তার গেল না কেন? মেঝেয় মাথা কুটে কুটে রক্তগঙ্গা বইয়েছে। এত বড় অন্যায়ের বিচার হল না, প্রতিকার হল না—এমন দুঃশাসনের দেশ! ইরাবনের দেশ। ইরাবনের ভয়ে সকলেই তটস্থ, যদিও তারা জানে কারা মেরেছে—বলল, আমরা দেখিনি কাউকে।

অধিরথের পা নেই, কিন্তু রেশমিনার তো আছে। রেশমিনাই অধিরথের পা-হাত—সব।

রেশমিনার দেখা না পেলে কি হবে—বিয়ে করার আশা ছাড়েনি ইরাবন। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেই, তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা না করতে বলে! মা যে রকম ভীতু, তড়িঘড়ি ব্যবস্থা না করে বসে। বাবাকে দিনরাত বোঝাচ্ছে, দরকার নেই ইরাবনকে ঘাঁটিয়ে।

বাবার মনটা এখনো শক্ত রয়েছে। রেশমিনার পক্ষে। যে পাত্রে অমত মেয়ের, সেখানে মেয়ে সঁপে দেয়াও যা, আর নিজে হাতে গলা টিপে মেরে ফেলাও তাই। বাবা এ কাজ কখনোই করতে পারবে না জীবন থাকতে।

বাবাকে যে কথা বলেছে রেশমিনা, বাবা রাজী। মা রাজী না হোক, তাতে বাবারও কিছু যায় আসে না। আর রেশমিনারও না। রেশমিনা কদিন ধরে ভেবে ভেবে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে, সেইটাই ঠিক। ইরাবনের শক্তিসামর্থ্য লোকলশকর—কি নেই? যার কিছু নেই, কেউ নেই, রেশমিনা তার হয়েই থাকবে সারাজীবন। অধিরথের জীবনসঙ্গিনী হবে সে।

মা শুনে আঁতকে উঠেছে, মড়ার সঙ্গে বিয়ে করার সাধ হল? ছোঁড়াটা তো শুষছে। আর বিয়ে করলে তোরা আস্ত থাকবি ভেবেছিস? অধিরথ কি মাথায় ঢুকিয়েছে নাকি এই সব? কোন্ লজ্জায় ও বিয়ে করতে চাইছে তোকে? নিজের দিকে চেয়েও দেখে না একবার? নিজের কথা ভাবে না একবারও? আশ্চর্য!

—আমি রয়েছি। ওর অত ভাবনাচিন্তার দরকার নেই তো। রেশমিনার স্পষ্ট জবাব।

মেয়েকে ভয় পায় মা। কিন্তু কথায় মুখ বন্ধ করলেও, মাকে কোন বিশ্বাস নেই। যে কোন কাজ ভণ্ডুল করতে মা সিদ্ধহস্ত।

রেশমিনা বলল বাবাকে, সামনের প্রথম লগ্নেই আমার শাদির ব্যবস্থা কর।

মৃদু হেসে, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে বাবা।

বাপ-বেটির ওপর কথা কওয়ার যো নেই মায়ের। মায়ের বুক ঢিপঢিপ করছে।

অধিরথ আপত্তি করেছে। ইরাবনের মাথা ঠিক হয়ে যাবে। নিজের ভুল বুঝবে ও। ওকে একটু সময় দেয়া উচিত।

রেশমিনা ক্ষেপে উঠেছে। বলছে, ওর নাম মুখে আনবে না আমার সামনে। ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আমায়। যদি প্রায়শ্চিত্ত করতে না দাও, দুনিয়ায় খুঁজে পাবে না আর আমাকে।

শিউরে উঠছে অধিরথ। মুখে কথা সরেনি আর।

অঘ্রানের বাতাসে হিম হিম আমেজ। রেশমিনার মনে কিন্তু উলটো। উষ্ণ উত্তেজনা। যদিও পাড়াঘরে কেউ জানে না, তবুও অধিরথের বাড়ি না পৌঁছুনো

পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না। শেষ রাত্তিরে শেষ লগ্নে বিয়ে।

অধিরথের আসা অসম্ভব। প্রথমত খোঁড়া মানুষ। দ্বিতীয়ত রেশমিনা চায় না এ বাড়িতে আসুক। বিয়ের নামে মা তো উত্থানশক্তিরহিত। ক্ষণে ক্ষণে দাঁতি লাগছে! চোখ কপালে উঠছে আর বেহুঁশ হয়ে পড়ছে।

বিয়ে হবে—কাকে বকে টের পায়নি। চুপিসাড়ে সারা হবে শুভ কাজ। তারপর জানানো হবে সকলকে। হকচকিয়ে যাবে প্রত্যেকে। ইরাবনের আশায় ছাই পড়বে চিরদিনের জন্য।

নিজের মনে নিজে হাসল রেশমিনা। সন্ধ্যের আগেই অধিরথের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হবে সে। যেমন অন্য দিনেও যায়। বাবা পুরোহিত ওখানেই রয়েছে। গোটা রাতটাই থাকবে।

চাঁপাফুল ভালোবাসে অধিরথ। চাঁপার মালা বিনুনিতে জড়িয়েছে। চাঁপা রঙের সিল্কের কুর্তি-ঘাগরা পরেছে। মেহেদির ছোপ লাগিয়েছে হাতে-পায়ে। চাঁপা রঙের ফিনফিনে পাতলা ওড়নায় মাথা থেকে বুক অবধি ঢেকে নিল।

মায়ের দিকে ফিরে তাকাল। শুয়ে আছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে। বলার আর কিছু নেই মেয়েকে।

বুঝিয়ে বলেছে বিয়ে বন্ধের কথা, শোনেনি। রোখ চেপেছে।

এ কেমন বিয়ে? দুলহা আসবে না, যাবে দুলহাইন?

—হ্যাঁ যাবে। সাবিত্রী যায়নি সত্যবানের কাছে?

মায়ের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল রেশমিনা। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, মেয়েকে বুকে চেপে ধরল মা। হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রেশমিনা। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মায়ের বুকের ভেতর খালি হয়ে গেল একদম। এরকম হয়নি কখনো।

রাস্তায় পা দিয়েই একটু থমকালো রেশমিনা। পুরনো রাস্তা নতুন ঠেকছে। লোক নেই একটাও! সন্ধ্যে না হতেই রাতের ছায়া। দোকান-পসার বন্ধ। বড্ড একা একা মনে হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি চলতে চেষ্টা করছে। রোজ গিয়ে গিয়ে যে রাস্তা কত কাছের হয়ে গেছে, আজ সে রাস্তা যেন সাতসমুদ্র পেরিয়ে। পা আর চলে না। অবসাদে ছেয়ে যাচ্ছে সারা দেহ।

কেন জানে না ভেতরে হাহাকার উঠছে। আর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের জলভরা দু'চোখ ভাসছে সামনে। সেই চোখে অধিরথের চোখও দেখছে আবার।

এতক্ষণে অধিরথ কি অস্থিরই না হয়ে পড়েছে। যেতে দেরী হলেই ও কেমন হয়ে পড়ে। দু'দিন জ্বরে পড়েছিল একবার। রেশমিনা যায়নি। অধিরথ খায়নি, ঘুমোয়নি। বাচ্চা ছেলের মতো কেঁদেছে কেবল ভগবতীর ছবির সামনে বসে।

জ্বর ছাড়তেই রেশমিনা গেছে। ঘরে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। অধিরথ কাঁদছে আর বলছে, মাকে কেড়ে নিলে, রেশমিনাকেও নিতে বসেছো। তোমার এত খিদে। আমাকে নাও, আমাকে নাও, আমাকে নাও। নিজের কপাল নিজে চাপড়াচ্ছে দু'হাতে।

চোখের জল চাপতে পারেনি রেশমিনা। কাছে গিয়ে ওড়নায় চোখমুখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছে, মনকে শক্ত করতে হয়। ধরো, আমি যদি মরেই যেতুম, ফিরে আসতুম না তো আর। মিছিমিছি কান্নাকাটি করবে কেন? ভুলে যেতে চেষ্টা করবে।

—আমি পারব না।

—কেন পারবে না? যা অতীত হয়ে যায়, তা অতীতই। ও নিয়ে নাড়াচাড়া করা ঠিক নয় একদম।

—অতীত ভুলতে পারি না আমি। পেছু পেছু ঘোরে।

—ও বাবা! এ যে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োর কথা।

অধিরথের মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে লজ্জায়। রেশমিনার মুখ থেকে চোখ নামিয়েছে, মাথা নিচু করেছে!

—বড় বড় কথা বলে আবার লাজুক সাজা হচ্ছে! হাসতে হাসতে বলছে রেশমিনা।

—মা-ও এই রকম বলত আমায়। 'লাজুক' কথাটা বড্ড মিষ্টি লাগে আমার। অধিরথের করুণ স্বরে ফুটে উঠছে মাতৃহারার বেদনা।

রেশমিনার যত চিন্তা যত ভাবনা এই অধিরথকে নিয়েই।

পথ চলতে চলতে মাথার মধ্যে এসব এসে তালগোল পাকাচ্ছে কেন? রেশমিনা বুঝতে পারছে না কিছু। ভেতরে একটা বোবাকান্না ডুকরে উঠছে। তার সঙ্গে মায়ের কান্না। কতক্ষণে অধিরথের কাছে পৌঁছুবে রেশমিনা? তর সইছে না আর একদণ্ডও।

দ্রুত পায়ে চলছে।

দেবপ্রিয়া ভীষণ হাঁপাচ্ছে। আংটির দিক থেকে দৃষ্টি ঘুরেছে। দু'চোখ বুজেছে। চোখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

মহাফাঁপরে পড়েছে ইন্দ্রনাথ। কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। এমন করছে কেন? এমন তো দেখেনি সে এর আগে! মাসীমণিকে ডাকবে না ডাক্তারকে?

ডাক্তার বলেছে, দেবপ্রিয়া আপন মনে যাই কিছু করুক যাই কিছু বলুক—লক্ষ্য রাখবে, শুনবে নীরবে। কোন রকমে সচেতন করে তুলবে না। তাহলে ওর গোপন-মনের ব্যাপার জানা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

আংটিটা নিয়ে এতক্ষণ স্বপ্নের ঘোরে ছিল যেন দেবপ্রিয়া। কোন সুদূরের

স্বপ্নরাজ্যে চলে গেছিল হয়তো। এ কান্নায় স্বপ্ন ভাঙছে, না নতুন স্বপ্ন দেখছে, কে জানে!

আচ্ছন্ন অবস্থায় টুকরো টুকরো যে দু-একটা কথা দেবপ্রিয়ার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তা বেশ অস্পষ্ট। ঘুম জড়ানো গলায় বলা।

রুপাদি ইন্দরদাকে ডেকে, বসে রইল চুপচাপ। অস্বস্তি বোধ করেছে ইন্দ্রনাথ। দেবপ্রিয়ার কান্না দেখে, ও-ও কাঁদছে।

ইন্দ্রনাথেরও দু'চোখ জ্বালা করছে, লাল হয়ে উঠছে। তবু ডাক্তারের নিষেধের জন্য নিজেকে সংযত করে রাখছে। জিজ্ঞাসা করছে না কোন কথা।

দেবপ্রিয়ার মুখ থেকে ঠিকরে এসে, যে-যে কথা ইন্দ্রনাথের কানে বিঁধেছে, অস্পষ্ট হলেও বোঝবার অসুবিধে হয়নি তার। একটি নাম একটি দিন একটি আঙুল।

ওই গ্রামে যাবে ইন্দ্রনাথ। ওই নাম খুঁজে বার করবে। ওই দিন আর আঙুলের রহস্যও জানতে পারবে নিশ্চয়। দেবপ্রিয়ার সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি?

দেবপ্রিয়ার কান্না থামছে না, বেড়েই চলেছে।

নিজেকে স্থির রাখা সম্ভব হয়ে উঠছে না আর। ইন্দ্রনাথের নিজের হৃৎপিন্ড গলে গলে দেবপ্রিয়ার চোখের জলে ঝরে পড়ছে যেন। ইন্দ্রনাথ ভুলে গেল ডাক্তারের নিষেধ। বলল, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে বলুন না। দয়া করে বলুন না।

'বলুন না'—দেবপ্রিয়া শুনল 'রেশমিনা'। মন্ত্রের মতো কাজ হল। কান্না থামল।

দেবপ্রিয়া হাত নামাল চোখ থেকে। চনমন করে তাকাল। কে ডাকল না রেশমিনা বলে? মনে হল, ঠিক অধিরথের গলা। দেবপ্রিয়ার জলভরা চোখে ঝাপসা দৃষ্টি। ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে দেখছে। দেখছে দেখছে দেখছে।

লোটন বসে থাকতে পারল না আর। কোচ থেকে উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবপ্রিয়ার কোলে।—রুপাদি, তুমি অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

চমক ভাঙল দেবপ্রিয়ার। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটল। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। গভীর ঘুম ভাঙিয়ে দিলে যেমন হয়। কথা কইতে পারছে না। চুপ করে চেয়ে আছে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছিল আপনার?

—কই, কিছু না তো।

—আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমরা যাচ্ছি এখন।

লোটনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ ঘর থেকে।

সোফায় গা এলিয়ে দিল দেবপ্রিয়া। নিজেকে খুব অবসন্ন ঠেকছে।

নিচে এসে, একলা ঘরে বসে বসে ভেবেছে ইন্দ্রনাথ, অনেক রহস্যের দানা একসঙ্গে জমাট বেঁধে বেঁধে পাথর হয়ে গেছে। দেবপ্রিয়ার মনের ওপর চেপে বসে আছে। আদৌ সরানো যাবে কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ।

কিন্তু যতই সন্দেহ থাকুক ইন্দ্রনাথের, দেবপ্রিয়ার অজানা দুঃখ-ভোগের ভাগীদার হতে মন চায় তার। সাধারণ মেয়ের মতো নয় ও। ওর চলন-বলন সমস্ত কেমন কেমন। তাই কি ওর ওপর এত আকর্ষণ, ওর ওপর এত সহানুভূতি ?

পাগল করে তুলছে ইন্দ্রনাথকে—গ্রাম নাম দিন আঙুল।

রাতে ঘুম আসেনি। সকালে রওনা হয়ে গেছে সহেটমহেট গ্রামে।

পুরনো লোকেরা ইন্দ্রনাথকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছে গাঁওয়ের অন্ধিসন্ধি অবধি। অধিরথের জীবনকথা শুনিয়েছে।

ধ্বংসস্তূপের পাশে এনে, ভাঙা শিবমন্দিরটা দেখিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। মন্দিরের গায়ে পাথরে খোদাই দেবদাসীর আঙুলের আংটি দেখিয়ে বৃদ্ধ মোড়ল বলেছে, আংটির এই গড়নটা রেশমিনার খুব পছন্দ হয়েছিল।

অধিরথ রেশমিনার জন্মদিনে এই গড়নের হলুদ পোখরাজ বসানো সোনার আংটি উপহার দিয়েছিল।

আংটি পেয়ে রেশমিনার খুশির সীমা-পরিসীমা ছিল না কিন্তু ইরাবনের ? মুখখানা কালো হয়ে গেছল একেবারে। প্রাণের বন্ধু অধিরথ বিষ হয়ে উঠল সেই থেকে।

এখানের মাটিতে বাতাসে গাছে আকাশে রাশি রাশি মৃত্যুবিষ দু'হাতে করে ছড়িয়ে দিয়েছে ইরাবন।

রেশমিনা পালিয়েছে। রেশমিনার সঙ্গে অধিরথও।

বৃদ্ধ মোড়ল একটু দম নিয়ে বলল, বাবু সাব্! কি ভাবছো—খোঁড়া অধিরথ পালালো কি করে ? রেশমিনা যার সহায়—সে খোঁড়া-কানা হলেও, অসুবিধে নেই কোন। রেশমিনা দুশমনের হাতে একা ছেড়ে দিয়ে যেতে পারে কি ? অধিরথ যে তার বুকের কলিজা বাবুজী।

বৃদ্ধের দু'চোখের কোণে জল টলমল করছে। ধরা-কাঁপা গলায় বলল, এই যে চতুর্দিকে গাছ—এরা কি সাংঘাতিক, কি বিশ্বাসঘাতক! এক একটা গাছ থেকে দুশমনেরা ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে।

সেটা বিয়ের দিন।

বিয়ের সাজে সেজে রেশমিনা একাই দৌড়চ্ছিল অধিরথের বাড়ি পৌঁছুনোর জন্য। হয়তো বিপদের কোন আভাস পাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে।

ঘিরে ধরল দুশমনেরা।

রেশমিনা সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠল।—কাছে কেউ এসেছ কি বিপদে পড়বে।

বিপদ কিসের ? তাদের পেছনে ইরাবন। ইরাবনের হুকুম, ধরে নিয়ে যেতে হবে রেশমিনাকে। চলল ধস্তাধস্তি। রেশমিনার রণরঙ্গিনী মূর্তি।

একজন লাঠিয়ালের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে। ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়ছে সবাই।

লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতেই বাতাসের বেগে ছুটছে রেশমিনা অধিরথের বাড়ির দিকে। আর একটুখানি পথ মাত্র।

একটুখানি পথ আর শেষ করতে পারল না রেশমিনা। নিজেই শেষ হয়ে গেল। পেছন থেকে লাঠি ঘুরিয়ে ছুঁড়ল কে। মাথায় লেগেছে সজোরে। ইরাবনের লাঠির ঘা। মর্মস্থানে আঘাত হেনেছে। রেশমিনা পড়ে গেল নির্দয় নিয়তির পরিহাসে।

বিয়ের গোপন ব্যাপারটা রেশমিনার জ্ঞাতিভাবে বাচ্চা ছেলের মুখ থেকে বাতাসে ভেসে বেড়িয়েছে। অনুসন্ধানী ইরাবনের কানে গিয়ে পৌঁছেছে।

রেশমিনার ওপর ইরাবনের নির্মম প্রতিশোধ নেয়ার কথা শুনে, সেই যে বেহুঁশ হয়ে পড়ল অধিরথ, আর জ্ঞান ফেরেনি। জ্ঞান হারানোর আগে একটি মাত্র কথাই মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—রেশমিনা না গিয়ে আমি গেলুম না কেন?

শুনতে শুনতে নিজেই অধিরথ হয়ে উঠেছে ইন্দ্রনাথ। এই সহেটমহেট গাঁয়ের বাতাস থেকেই বুক ভরে নিশ্বাস নিয়েছে সে, মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েছে কত। মায়ের কাতর কান্না আর রেশমিনার জলভরা চোখ মৃত্যুশয্যা থেকে টেনে তুলেছে তাকে বহুবার। মায়ের মতো হুবহু রেশমিনা। মন প্রকৃতি দুই-ই। তার ওপর ইরাবনের নির্মম ব্যবহারের জন্য জিদের বশে রেশমিনা বিয়ে করতে চেয়েছিল তাকে। অসহায় ভেবেও। কিন্তু তার মন চায়নি একদম। তার চোখে রেশমিনা পবিত্রের প্রতিমূর্তি। দেবী। দু'চোখ জলে ভিজে উঠেছে ইন্দ্রনাথের। ইন্দ্রনাথের ভেতরটা হু-হু করে উঠছে। ফিরে গিয়ে দেব-প্রিয়াকে দেখতে পাবে তো?

দাঁড়াল না আর। স্টেশনের দিকে দৌড়ল।

ইন্দ্রনাথ বাড়ি এসে পৌঁছুল যখন, তখন অনেক রাত। মাঝরাত তো পেরিয়েই গেছে। গোটা বাড়িটা শূন্য-শূন্য মনে হচ্ছে।

ওপরে গেল। অমরাবতী নেই, নেই দেবপ্রিয়া। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আলোয় আলো হয়ে উঠতে দেখল পূব দিকে। দেবপ্রিয়াদের কোয়ারিতে সমস্ত আলো জ্বলে উঠেছে। রাত্তিরে কাজ হওয়ার কথা আছে। ব্লাস্ট করা হবে। পাহাড়ের চামড়া মাংস খুবলে খুবলে বার করে নেয়া হবে। দেখতে গেছে হয়তো ওরা। কাজের সময় তো মেসোমণি ওখানে থাকেই, কিবা রাত কিবা দিন।

ইন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। ছোটার মতো চলা কেন—ছুটছেই।

আলো জ্বলতে অমরাবতী খুশী। অন্ধকারে আলো জ্বলে ওঠা, তাও আবার ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কম সুলক্ষণ নয়।

যে মুহূর্তে অমরাবতীর সিদ্ধান্তটা স্থির হল, নানা বিচার বিশ্লেষণ করে, সেই মুহূর্তেই আলো জ্বলে উঠল।

অমরাবতী লক্ষ্য করেছে, ইন্দ্রনাথ আসার পর থেকে দেবপ্রিয়ার ঘুমন্ত অবস্থায় বেরোনো রোগ সেরেছে। চলে যেতেই শুরু হয়েছে আবার। ফল্গু নদীর চাপা স্রোতের মতো ইন্দ্রনাথের টান রয়েছে দেবপ্রিয়ার ওপর। হাবভাবে বেশ বোঝা যায়। বিয়ের প্রস্তাব দিলে, অমত করতে পারে না ও ছেলে। ওকে আটকাতে হবে।

দেবপ্রিয়াকে ইন্দ্রনাথের হাতে সঁপে দিতে পারলে, মরণেও সুখ অমরাবতীর।

জায়গাটার অন্ধকার কেটেছে, রাতে দিনের আলো ফুটেছে। ইউকেলিপটাস গাছের তলায়ও আলো। দেবপ্রিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছিল। উঠে দাঁড়াল।

অমরাবতী মনে করল বাড়ির দিকে আসবে। এলো না। কোয়ারির দিকে এগোচ্ছে। বাতাস কাঁপল মাটি কাঁপল। গুমগুম শব্দে পাহাড়ের বুকফাটা কান্না ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। পাহাড়ের বুক থেকে নীল আলোর ঝলকে আঁকাবাঁকা ঢেউ তুলে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

পাথরের চাঁই ঠিকরে এসে ডান পায়ে লাগল দেবপ্রিয়ার। দেবপ্রিয়া লুটিয়ে পড়ল পাথুরে রাস্তায়। সহ্যের অতিরিক্ত আঘাত। এতটুকু আওয়াজ বেরোল না মুখ দিয়ে।

অমরাবতী আর্তনাদ করে উঠত। উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না। মাটি আঁকড়ে ধরে টেনে রেখেছে তাকে।

দেবপ্রিয়াকে পড়ে যেতে দেখেছে ইন্দ্রনাথ। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। সাধ্যের বাইরে চিৎকার করে বলছে, ব্লাস্ট করা বন্ধ কর, বন্ধ কর।

কে কার কথা শুনবে! কার কানে পৌঁছুবে এ আকুতি? পাহাড়ের আর্তনাদে মানুষের আর্তচিৎকার চাপা পড়ে গেল, হারিয়ে গেল।

দেবপ্রিয়াকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এলো ইন্দ্রনাথ বাড়িতে।

দেবপ্রিয়ার ডান পাটাকে শত চেষ্টা করেও রাখতে পারেনি ডাক্তাররা। বাধ্য হয়ে বাদ দিয়েছে।

ইন্দ্রনাথের মনে হয়েছে এর জন্য সে-ই দায়ী। একটু আগে এসে পড়লে, খোঁড়া হত না দেবপ্রিয়া। অমরাবতী কেঁদে বলেছে ইন্দ্রনাথকে, তুমি থাকলেও বেরোয় না। তুমি বাইরে না গেলে, এ বিপদ হত না। মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

ইন্দ্রনাথের মর্মপীড়ার শেষ নেই, আপসোসের অন্ত নেই। পাথর খনিতে গিয়ে দুপুর রোদ্দুরে বসে বসে ভেবেছে। তার পা-ই দেবপ্রিয়ার পা, তার হাত-ই দেবপ্রিয়ার হাত। কিসের অসহায় দেবপ্রিয়া!

মাস কয়েক ধরে সেবার কোন ত্রুটি করেনি ইন্দ্রনাথ। দেবপ্রিয়ার পায়ের

অভাব বুঝতে দেয়নি মোটে। বিছানায় শুয়ে বসেই প্রয়োজনীয় সব কিছু পেয়ে গেছে কাছে। ইন্দ্রনাথের দৌলতে।

'আপনি' বলার ভব্যতা কখন দুজনের অজ্ঞাতসারে টুপ করে খসে গেছে। দুজনে দুজনকেই 'তুমি' বলে সম্বোধন করে। নাম ধরে ডাকে। গল্পগুজব করে। বহুদিনের খেলার সঙ্গী এক সঙ্গে মিললে যেমন আনন্দ পায়, সেই রকম আনন্দ পায় ওরা দুজনে।

ইন্দ্রনাথকে কাছে পেয়ে পা হারানোর ব্যথা ভুলে গেছে দেবপ্রিয়া। আর দেবপ্রিয়াকে কাছে পেয়ে, কতদিনের সমস্ত কিছু হারানো ফিরে পেয়েছে ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথের ভেতর ভরর্ভতি হয়ে আছে সর্বক্ষণ।

এই ভরর্ভতি খালি করে দেয়ার জন্যে ইন্দ্রনাথের মা হন্যে হয়ে উঠল একেবারে। ছেলে ঘরমুখো হতে চায় না একদম। মা ভুলেছে বাপ ভুলেছে। আর ছেড়ে রাখা যায় না। একটা খোঁড়া মেয়ের সেবা নিয়ে দিনরাত ব্যতিব্যস্ত। সোনার চাঁদ মুখখানা কালি হয়ে গেছে।

এলাহাবাদ থেকে মা এসেছে বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। আমীর ঘরের মেয়ে, রূপসী। মা কথাও দিয়ে এসেছে। ছেলেকে নিয়ে যাবে।

ইন্দ্রনাথ বেঁকে বসল। যাবে না। মায়ের দেখা মেয়ে বিয়ে করবে না। তাকে না জিজ্ঞেস করে মা কথা দেয় কেন? মা দিয়েছে, মা বুঝুক। কোন দায়দায়িত্ব নেই তার।

দেবপ্রিয়ার কাছে এসে, মা কেঁদে ভাসাল। দোহাই মা। আমি পর হয়েছি, তুমি ওর আপনার এখন। তুমি বুঝিয়ে বললেই যাবে। না গেলে, কি যে বেইজ্জতি তোমাকে বোঝাবো কি! ফিরে গিয়ে লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারব না আর।

হাত ধরে বলেছে মা, লছমীরানী আমার। অনেক কষ্টে মানুষ করেছি ছেলেকে। তুমি মা হওনি। মায়ের ব্যথা বুঝবে না। বোঝাতে চাইও না। দয়া করে আমার ছেলে আমাকে ফিরিয়ে দাও। তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি আমি।

ইন্দ্রনাথকে ফেরানোর চেষ্টা করেছে দেবপ্রিয়া। হিতে বিপরীত হয়েছে। বলেছে, দ্যাখো না, মায়ের সব মতলব ভেস্তে দিচ্ছি।

অমরাবতীর কাছে ছুটে গেছে ইন্দ্রনাথ। দেবপ্রিয়াকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়ে এসেছে। শীগগির ব্যবস্থা করতেও বলেছে।

ইন্দ্রনাথকে বলেছে দেবপ্রিয়া, মায়ের কথা শোন। মাথাটা ঠাণ্ডা কর। আর চিন্তা না। দেখবে, মা যা বলছে, ঠিকই।

অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বলেছে ইন্দ্রনাথ, তুমি অমত করলে, এ দুনিয়ার কোন জায়গায় কখনো খুঁজে পাবে না আর আমায়!

দেবপ্রিয়া শিউরে উঠেছে। ছাঁত করে উঠেছে বুকের ভেতর।

ইন্দ্রনাথের সরল শিশুসুন্দর মুখে থরে থরে কালি জমতে দেখেছে। দেবপ্রিয়ার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয়নি আর।

একরোখা ছেলের জিদের কাছে মা-বাবার বক্তব্যে ইচ্ছের পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। ছেলেকে হারাতে চায় না তারা। ছেলের মত—এখানে থেকেই দেবপ্রিয়ার সঙ্গে বিয়ে হবে তার। খানিক দূরে কোয়ারির ওদিকটায় বন্ধুর বাড়ি। ওখান থেকেই বিয়ে করতে আসবে সে এ বাড়িতে। মা-বাবা মেনে নিয়েছে।

চাঁপাফুল ভালোবাসে ইন্দ্রনাথ। রংটাও। চাঁপা ফুল রঙের শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে দেয়া হয়েছে দেবপ্রিয়াকে। মাথার এলোখোঁপায় চাঁপাফুলের বেড়। হাতে মেহেদির ছোপ। লাল কাঁচের চুড়ির সঙ্গে সোনার চুড়ি। বালা। ওপর হাতে বাজু, গলার হার, কানে ছোট ছোট হলুদ পোখরাজ বসানো কানবালা, নাকে হলুদ পোখরাজের নাকছাবি। ইন্দ্রনাথের হলুদ পোখরাজের আংটিটাই আঙুলে পরা আছে স্রেফ। অন্য আংটি পরতে চায়নি দেবপ্রিয়া। মাঝে মাঝে আংটিটা দেখছে।

সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। রাত্রি নেমেছে।

ব্যাগপাইপের বাজনা ভেসে আসছে, ভেসে আসছে ব্যাণ্ডের বাজনা। দু'সারি গ্যাসের ঠাণ্ডা আলো এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আকাশের সমস্ত তারা খসে পড়েছে যেন মাটির বুকে।

ঘোড়ায় চেপে বর আসছে। ইন্দ্রনাথ। ফুল-জরির ঝালরে মুখঢাকা। পরনে লাল সিল্কের পাজামা আচকান। পায়ে লাল ভেলভেটের নাগরা। মাথায় লাল সিল্কের পাগড়ি।

বর আসছে কোয়ারির রাস্তা ধরে।

দেবপ্রিয়াদের বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েরা আনন্দে ডগমগ। রঙবেরঙের ফুল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির দোরে বর এলে, গায়ে-মাথায় ছুঁড়ে মারবে। মদনের ফুলবান।

ঘরের ভেতর যে মেয়েরা দেবপ্রিয়াকে ঘিরে এতক্ষণ হাসিমশকরা করছিল, তারা গলায় গলা মিলিয়ে গান ধরেছে।—না আইলন সাঁইয়া সখিয়াঁ। রাতিয়াঁ বিত জায়ে । কেঁদে কেঁদে চলে যায় সোহাগের রাত সই। প্রিয়া এলো কই···।

দেবপ্রিয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। তামাশা—গান, কোন কিছুই কানে যাচ্ছে না তার। সে যেন এত আনন্দের মাঝে থেকেও নেই। পাথরপ্রতিমা চাঁপা রঙের ভেলভেটের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে খাটে।

পাথরপ্রতিমার বুক কেঁপে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণা। বাইরে কোয়ারিতে ব্লাস্ট করা হচ্ছে, পাহাড় ফাটছে, পাথর ছিটকোচ্ছে। পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় বারুদের তরল আগুন দাপাদাপি করছে, ছুটোছুটি করছে।

গুমগুম শব্দে ঘোড়াটা ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেছে। এলোমেলো ছুটছে, কোন বাগ মানছে না ইন্দ্রনাথের। চার পা তুলে লাফাচ্ছে। লাগাম ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠছে।

পাথরজমির ওপর পড়ে গেল ইন্দ্রনাথ।

হঠাৎ বিষাদ নামল বাড়িময়।

অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে আসা হল ইন্দ্রনাথকে বাড়িতে।

দেবপ্রিয়ার কানে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জোর করে বুক চেপে ধরেছে দু'হাতে। পাথরখানির গোটা পাহাড়টাই বুকে এসে চেপে বসেছে যেন, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথা লুটিয়ে পড়েছে বিছানায় পাতা চাঁপারঙের গালচের ওপর।

ইন্দ্রনাথ চোখ খোলেনি আর। বাইরের বাতাস থেকে নিশ্বাস টেনেও নেয়নি আর।

দেবপ্রিয়া কখন হিম হয়ে গেছে, টের পায়নি কেউ।

অমরাবতী নিস্পন্দ—পাথরমূর্তি। চোখে জল নেই মুখে কথা নেই। দুটি করুণ স্বর—দেবপ্রিয়ার আর ইন্দ্রনাথের—একসঙ্গে কানে বাজছে।—সেই আমি সেই আমি সেই আমি

— —